বিচিত্রা

বিচিন্তা

রাজশেখর বসু



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

২য় সংস্করণ : ২২০০ সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৬৩

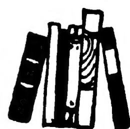
প্রথম সংস্করণ :
৭ই চৈত্র, ১৩৬২

দু টাকা
চার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬







এই প্রবন্ধগুলি গত সাত বৎসরে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। গল্প নয়, 'রম্য রচনা'ও নয়, সাধারণের ভাল লাগবে কিনা জানি না। কিন্তু বাঙালী পাঠকের রুচি আজকাল প্রসারিত হয়েছে, অন্তত জনকয়েকের চিন্তার খোরাক যোগাবে এই আশায় প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

ফাল্গুন, ১৩৬২

—রাজশেখর বসু

ইহকাল পরকাল

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—অন্ধকার ঘরে একজন অন্ধ একটি কালো বেরালকে ধরবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বেরাল সে ঘরেই নেই ; একেই বলে দার্শনিক গবেষণা।

দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাঁধাধরা নয়, তাই এই উপহাস। বৈজ্ঞানিক মত প্রায় সর্বসম্মত। কোনও এক মতে যদি মোটামুটি কাজ চলে তবে সকল বিজ্ঞানীই তা মেনে নেন, এবং পরে যদি আরও ব্যাপক ও যুক্তিসম্মত নূতন মত আবিষ্কৃত হয় তবে বিনা দ্বিধায় পূর্বের ধারণা ছেড়ে দিয়ে নূতন মতের অনুবর্তী হন। পূর্বে লোকে মনে করত যে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধারণা অনুসারেও গ্রহণ প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষিক ব্যাপারের গণনা করা যেত সেজন্য সেকালের বিজ্ঞানীরা তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন বুঝেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তে অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অবশেষে দেখা গেল যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহই তাকে বেষ্টন করে ঘোরে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জ্যোতিষগণনা সরল হয় এবং সমস্ত অসংগতির অবসান হয়। তখন সকল বিজ্ঞানীই নূতন মত মেনে নিলেন। নিউটনের মহাকর্ষবাদ এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু আইনস্টাইনের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসম্মত মনে হওয়ায় সকল বিজ্ঞানীই এখন তা মেনে নিয়েছেন, যদিও সব রকম স্থূল গণনায় নিউটনের সূত্রেই কাজ চলে।

দার্শনিক তত্ত্বে এ রকম সর্বসম্মতি দেখা যায় না। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী তাঁর পাঠ্যপুস্তকে যেসব তথ্যের বর্ণনা পান তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তথ্যের যাঁরা আবিষ্কর্তা বা মতের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের নাম পুস্তকে

থাকে বটে, কিন্তু তা নিতান্ত গৌণ। পক্ষান্তরে দার্শনিক পাঠ্যপুস্তকে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না; শংকর বা রামানুজ বা বৌদ্ধাচার্যগণ কি বলেছেন, স্পিনোজা হিউম বার্ক্‌লি হেগেল প্রভৃতির মত কি—এই সব আলোচনাই থাকে, সত্যজিজ্ঞাসু পাঠককে দিশাহারা হতে হয়। আমাদের টোলের বা কলেজের ছাত্ররা যা পড়েন তা দার্শনিক তথ্য নয়, দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস। বিজ্ঞান আর দর্শনের এই প্রভেদের কারণ—বিজ্ঞান প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ে কারবার করে, তার সহায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তদাশ্রিত অনুমান; কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কিনা তা বার বার পরীক্ষা বা নিরীক্ষার পর স্থির করা হয়। জ্‌ল বললেন, এতটা শক্তি রূপান্তরিত হয়ে এতটা তাপ উৎপন্ন করে; তিনি পরীক্ষা করে তা দেখিয়ে দিলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানী অনুরূপ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে জ্‌লের সিদ্ধান্ত ঠিক। গীতায় আছে, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নব বস্ত্র পরে, সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নব শরীর গ্রহণ করে; কিন্তু গীতাকার প্রমাণ দিলেন না। বার্ক্‌লি বললেন, ঈশ্বরের চৈতন্যই সকল পদার্থের আধার, কিন্তু কোন্ উপায়ে ঐশ্বরিক চৈতন্য উপলব্ধি করা যায় তা বললেন না। দার্শনিক মতের প্রমাণ নেই—অন্তত আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে এমন প্রমাণ নেই, তাই পরস্পরবিরুদ্ধ নানা মতের উৎপত্তি হয়েছে এবং লোকে রুচি অনুসারে পুনর্জন্ম স্বর্গনরক নির্বাণ দ্বৈতবাদ মায়াবাদ দেহাত্মবাদ প্রভৃতি যা খুশী মেনে নেয়।

বিজ্ঞান আর দর্শনের মাঝে একটি প্রান্তভূমি আছে, পণ্ডিতরা বহু দিন থেকে সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। এই গহন প্রদেশে এখনও ইচ্ছামত পরীক্ষা বা নিরীক্ষা চলে না তাই তত্ত্বান্বেষীকে প্রধানত অনুমান আর কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। যাঁরা কঠোর যুক্তিবাদী তাঁরা অতি সতর্ক হয়ে যথাসাধ্য অপক্ষপাতে রহস্য ভেদের

চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এই অনুসন্ধানে এখনও বেশী মতৈক্যের আশা নেই এবং কল্পনার বিলাস অবাধে চলছে। তারই নমুনাস্বরূপ কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

বিদ্যাসাগর বোধোদয়ে লিখেছেন (ভাষাটি ঠিক মনে নেই)—'আমরা ইতস্তত যে সমুদায় বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ কহে।' আর একটু বিশদ করে বলা যেতে পারে—আমরা যেসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথক পৃথক বিষয়ের সংস্রবে আসি তাদের নাম পদার্থ। মানুষ জন্তু গাছ নক্ষত্র পাহাড় নদী বাড়ি ইট শস্যকণা জীবাণু সবই পদার্থ। পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হতে পারে, কিন্তু অনেক পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ দেখবার সুযোগ আমাদের নেই, যেমন নক্ষত্র, হিমালয় পর্বত। পদার্থ মাত্রই নিরন্তর বদলাচ্ছে, আজ যেমন আছে কাল তেমন থাকবে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর, সেজন্য আমাদের অগোচর।

একটি দার্শনিক সংজ্ঞা আছে—একদেশসম্বন্ধ। আমি যখন কোনও গাড়িতে চড়ি বা বিছানায় শুই তখন আমার সর্ব দেহ দিয়ে গাড়ি বা বিছানার সমস্তটা ব্যাপ্ত করে থাকি না, এক অংশেই থাকি, তাই তার সঙ্গে আমার একদেশসম্বন্ধ হয়। মায়ের সঙ্গে কোলের ছেলের, আমার সঙ্গে আমার হাতে ধরা কলমের এই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অল্পকালস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, একবার ঘুচে গিয়ে আবার স্থাপিত হতে পারে, চিরকালের জন্য লুপ্তও হতে পারে। একদেশসম্বন্ধের ন্যায় এককালসম্বন্ধও আমরা কল্পনা করতে পারি। আমার পিতা এখন মৃত। তিনি আর আমি কয়েক বৎসর একই কালে বিদ্যমান ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার এককালসম্বন্ধ ছিল। দুজন লোক যদি একই মুহূর্তে জন্মায় এবং এক সঙ্গেই মরে তবে বলা

যেতে পারে যে তাদের সমকালসম্বন্ধ আছে, কিন্তু এমন সম্বন্ধ দুর্ঘট। কোনও সময়ে জগতে যত লোক জীবিত থাকে তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় বা সাক্ষাৎকার না হলেও এককালসম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ মৃত্যুতে ছিন্ন হয়, একদেশসম্বন্ধের ন্যায় পুনর্বার স্থাপিত হতে পারে না। জীবন-মৃত্যু মিলন-বিরহ আমাদের পক্ষে চিত্তবিক্ষোভকর গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু উদাসীন তত্ত্বদর্শী বলেন—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্‌বদ্‌ভূতসমাগমঃ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব)

—মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক খণ্ড কাষ্ঠ অপর এক কাষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার দূরে চলে যায়; প্রাণিগণের মিলনবিরহও সেইরূপ।

আমরা কি শুধুই 'কাষ্ঠং কাষ্ঠং'? মৃত্যুর পরে কি পুনর্বার মিলনের সম্ভাবনা নেই? হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান এক বাক্যে বলেন, অবশ্যই আছে, আত্মা মরে না, পরজন্মে অথবা স্বর্গে বা নরকে আবার মিলন হতে পারবে। এই ধারণায় মন তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী এমন শূন্যগর্ভ আশ্বাসে ভোলেন না। তিনি বলেন, ইহকালে আমাদের অস্তিত্ব কি রকম তাই আগে জানা দরকার, পরকালের কথা পরে ভাবব। শাস্ত্রে আছে—'আত্মানং বিদ্ধি', আত্মাকে জান। আত্মা বললে ঠিক কি বোঝায় তা জানি না; তার বদলে আমার প্রত্যক্ষ স্থূল সত্তাকে বোঝবার চেষ্টা করব।

বোধোদয়ের মতে আমি একটি চেতন পদার্থ, ধরাধামে আমার অস্তিত্ব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। বাল্যকালে আমি যেরকম ছিলাম এখন সেরকম নেই, শরীর আর মতিগতি অনেক বদলেছে। এই

পরিবর্তমান আমি কি একই পদার্থ? বহু লোকে বলেন, দেহের আর মনের যতই অদলবদল হ'ক তোমার আত্মা বরাবর একই আছে, পরলোকেও থাকবে। যাঁরা বলেন তাঁরা কেউ পরলোক-ফেরত নন, সুতরাং তাঁদের কথার মূল্য নেই। গীতায় আছে, জীব আদিতে ও মরণান্তে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত; অর্থাৎ জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরে জীবের অবস্থা অজ্ঞাত, কেবল জীবিতাবস্থাই জ্ঞাত। অতএব এই প্রত্যক্ষ জীবিতাবস্থারই বিচার করে দেখা যাক আমার সত্তা কিরকম। আমার ছেলেবেলার ছবির সঙ্গে বুড়ো বয়সের ছবির অল্প মিল থাকতে পারে, কিন্তু দুটি বিভিন্ন ক্ষণিক বিষয়ের প্রতিরূপ। আমার স্বভাব শক্তি রুচি বিদ্যাবুদ্ধিরও এইরকম পরিবর্তন হয়েছে। বস্তুত আমি একটি পদার্থ নই, অসংখ্য পদার্থের পরম্পরা, যেমন সিনেমার ছবি। মনে করুন হীরাবাই-নাটকের সিনেমা-ফিল্ম দশ হাজার ফুট লম্বা। তার সমস্ত রীলকে বলা যেতে পারে হীরাবাই-ফিল্ম, কিন্তু এক টুকরোকে এ নাম দেওয়া যায় না। ফিল্মের রীল যখন কৌটায় থাকে তখন খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে, অর্থাৎ তার দু-চার ঘন-ফুট দেশব্যাপ্তি আছে। কিন্তু তার ছবি যখন পর্দায় দেখানো হয় তখন তার প্রায় ২০০ বর্গ-ফুট দেশব্যাপ্তি হয় এবং সেই সঙ্গে প্রায় দু ঘণ্টা কালব্যাপ্তি হয়। দেশে কালে ব্যাপ্ত এই চিত্র পরম্পরাই হীরাবাই-নাটকের যথার্থ প্রতিরূপ; ফিল্মের রীল সেই প্রতিরূপের উৎপাদক মাত্র।

অতএব আমার যথার্থ সত্তা আমার সমগ্র জীবন। শুধু দেশে কালে ব্যাপ্ত আমার শরীর নয়, আমার চিত্ত ও কর্মও এই সত্তার অঙ্গীভূত। যদি সত্তর বৎসর বাঁচি তবে এই সময়ের মধ্যে আমার শারীরিক মানসিক যত পরিবর্তন হয়েছে, আমি সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ যা ভোগ করেছি, সুকর্ম দুষ্কর্ম যা করেছি, সব সুদ্ধ নিয়ে আমার সত্তা। আমাকে পদার্থ বললে ছোট করা হবে, আমি সত্তর বৎসর

ব্যাপী একটি ঘটনাপ্রবাহ। এ ভিন্ন যদি আমার অন্যবিধ সত্তা মানা হয় তবে তা ক্ষণিক, অসম্পূর্ণ, অথবা অপ্রমাণিত!

আপাত দৃষ্টিতে হিমালয় যতই অটল অচল মনে হ'ক, তারও পরিবর্তন ঘটছে, অতএব হিমালয় একটি ঘটনাপ্রবাহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এইরকম, তাই 'জগৎ' আর 'সংসার' নাম। গঙ্গার যে জলরাশি এই মুহূর্তে দেখছি পর মুহূর্তে তা চলে গেছে, তার স্থানে অন্য জলরাশি এসেছে, তটরেখাও ক্রমশ বদলাচ্ছে, গঙ্গার কোনও অংশই স্থায়ী নয়। এই কারণেই গ্রীক পণ্ডিত হেরাক্লাইটস বলেছিলেন, একই নদী দুবার পার হওয়া যায় না। নির্বাত স্থানে প্রদীপের শিখা একটি স্থির পদার্থ বলে মনে হয়। তেলের বাষ্প আর বাতাসের অক্সিজেন একসঙ্গে মিশে জ্বলছে এবং এই দুই উপাদান নিরন্তর বদলাচ্ছে; এই ঘটনাপ্রবাহকেই আমরা দীপশিখা রূপে দেখি।

প্রদীপ নিবে গেলে তার শিখা কোথায় যায়? মৃত্যুর পরেও কি আত্মার অস্তিত্ব থাকে? আমরা কিছুই জানি না। নদী আর প্রদীপ অচেতন তাই তাদের আত্মার কথা আমাদের মনে আসে না। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চেতন অবস্থায় যে অহংজ্ঞান থাকে, আমি পূর্বে এই করেছিলাম, এখন এই করছি, এই ছিলাম, এখন এই হয়েছি—এই ধারাবাহিক জ্ঞান বা স্মৃতিই আমার ব্যক্তিত্ব, তাকেই আত্মা মনে করতে পারি। মহাভারতের উপমা অনুসারে বলা যেতে পারে—মহাকালসমুদ্রে ঘটনাপ্রবাহরূপ অসংখ্য কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আমি তাদেরই একটি। অন্যান্য যে সকল সচেতন কাষ্ঠ আমার সংসর্গে আসে—অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যখন আমার এককাল-সম্বন্ধ হয় তখন তাদের আমি জীবিত মনে করি। যে কাষ্ঠ সরে যায় তাকে মৃত মনে করি। আমি স্বয়ং যখন আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে চলে যাই তখন তারা আমাকে মৃত মনে করে। তার পরেও

আমার চেতনা বা ব্যক্তিত্ববোধ থাকে কিনা তা বলা আমার সাধ্য নয়।

এই পর্যন্ত মেনে নিতে বিশেষ বাধা হয় না, কিন্তু পরে যা বলছি তা বিভিন্ন পণ্ডিতের অনুমান বা কল্পনা মাত্র। সিনেমার ছবি একবার দেখানো হলেই তার বিনাশ হয় না; চিত্রপ্রবাহরূপ যে ঘটনার একবার অবসান হয়েছে আবার তা দেখানো যেতে পারে, কারণ, তার মূলীভূত ফিল্মের তো বিনাশ হয় নি। আমাদের জীবনরূপ চলচ্চিত্রের মূলস্বরূপ কি কিছু নেই? বিজ্ঞানী বলেন, আমরা যে লাল নীল প্রভৃতি রং দেখি তা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র, আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ভেদই আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রং বলে মনে হয়। সেই রকম বলা যেতে পারে যে মহাকাল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, আমাদের মনের গুণে (বা দোষে)ই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের ভেদজ্ঞান হয়। যা বর্তমান তারই অস্তিত্ব আছে, যা অতীত আর ভবিষ্যৎ তার অস্তিত্ব এখন নেই—এমন মনে করব কেন? সমস্তই সিনেমা-ফিল্মের রীলের ন্যায় যুগপৎ বিদ্যমান, সমস্তই নিত্য; আমার মনের শক্তি সীমাবদ্ধ তাই কালকে খণ্ড খণ্ড করে উপলব্ধি করি। বহু পণ্ডিতের মতে দেশ ও কাল illusion বা অধ্যাস বা মায়া মাত্র।

একদেশসম্বন্ধ ছিন্ন হলে আবার তা স্থাপিত হতে পারে, সেইরকম এককালসম্বন্ধ কি পুনস্থাপিত হতে পারে না? কালসমুদ্রে বিয়োজিত দুই কাষ্ঠের পুনর্মিলন কি অসম্ভব? যদি অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সমস্তই একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে তবে আপাতদৃষ্টিতে কালব্যবধান যতই থাকুক, এক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আর এক ঘটনাপ্রবাহের পুনর্বার সংযোগ অসাধ্য নাও হতে পারে।

পনর-বিশ বৎসর পূর্বে J. W. Dunne কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন—

An Experiment with Time, The New Immortality, The Serial Universe, ইত্যাদি। এইসকল গ্রন্থে তিনি কাল এবং সংবিৎ (consciousness) সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করেছেন এবং বলেছেন যে চেষ্টা করলে স্বপ্নযোগে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বিষয় কিছু কিছু জানা যায়, অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বর্তমান ব্যক্তিগত ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ করা যায়। তিনি অনেক যুক্তি দিয়ে এবং অঙ্ক কষে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সংবিৎ বা চেতনা চিরস্থায়ী, অর্থাৎ আমরা সকলেই অমর। উক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হলে বিলাতের সুধীসমাজে একটি প্রবল সাড়া পড়েছিল, খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এবং অনেক বিজ্ঞানীও বলেছিলেন যে এই মত উপেক্ষার যোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণের আগ্রহ বেশী দিন রইল না, এখন আর Dunne-এর নাম বড় একটা শোনা যায় না। সম্ভবত তাঁর নির্দেশিত উপায়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা সন্তোষজনক ফল পান নি।

দিব্যদৃষ্টি আর ত্রিলোক-ত্রিকাল-দর্শিতার কথা পুরাণে আছে। clairvoyance, telepathy, medium-এর মধ্যতায় মৃতজনের সঙ্গে আলাপ, ইত্যাদিতে আস্থাবান লোকেরও অভাব নেই। কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী মুখের কথায় বিশ্বাস করেন না, অতি-সাধু লোকের সাক্ষ্যও অভ্রান্ত মনে করেন না। বাজিকর আর ভণ্ড লোকে অনেক অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী উকিল জজ বা পুলিসের পক্ষেও তার রহস্যভেদ সুসাধ্য নয়। সম্প্রতি আমেরিকায় Rhine এবং ইংলাণ্ডে Soal প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করেছেন যাতে প্রতারণা অসম্ভব। এঁদের গবেষণার উপকরণ—কতকগুলি কার্ড যাতে নানা রকমের চিহ্ন আঁকা আছে। এই কার্ডগুলি যন্ত্রের সাহায্যে একে

একে একজন লোককে দেখানো হয় এবং দূরবর্তী অন্য ঘরে আর একজন লোক আন্দাজে সেই অদেখা কার্ডের বর্ণনা দেয়। অধিকাংশ স্থলে অনুমানে ভুল হয়, কিন্তু বহুবার বহু লোককে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কিছু কিছু মিলে যায়। সব মিলই আকস্মিক এমন বলা যায় না, কারণ, probability বা সম্ভাবনা-গণিত অনুসারে আকস্মিক মিল যত হতে পারে তার চেয়ে বেশী মিল দেখা গেছে। এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে জনকতক লোকের অল্পাধিক মাত্রায় telepathy বা দূরবেদনের ক্ষমতা আছে এবং সম্ভবত সকল লোকেরই ঈষৎ মাত্রায় আছে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা গেছে যে দ্বিতীয় লোকটি অন্য ঘরে প্রদর্শিত কার্ডের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কার্ড অনুমান করেছে, অর্থাৎ সে অতীত বা ভবিষ্যৎ দর্শন করেছে।

এইপ্রকার পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গেছে তা বৃহৎ নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের মতে তার গুরুত্ব আছে। পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ইহকাল-পরকালের স্পষ্ট সম্বন্ধ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু কয়েক-জন দার্শনিক আর বিজ্ঞানী এই সামান্য প্রমাণ অবলম্বন করে দেশ-কাল-আত্মা সম্বন্ধে নানারকম সিদ্ধান্ত করেছেন, আবার অন্যে তাঁদের ভুলও দেখিয়েছেন। মানুষ বহুকাল থেকে আকাশে ডানা মেলে ওড়বার স্বপ্ন দেখেছে; চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার বিফল হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন যে বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রে (অর্থাৎ এয়ারোপ্লেনে) মানুষ কখনও উড়তে পারবে না, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হয়েছে। অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে সতর্ক গবেষণা সবে আরম্ভ হয়েছে, তা সফল হবে কি বিফল হবে এখনই বলা অসম্ভব। ভবিষ্যতে হয়তো অনেক আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কৃত হবে, অন্ধকার ঘরে কালো বেরাল ধরা না পড়লেও অন্তত তার কিঞ্চিৎ লোম হস্তগত হবে ; কিন্তু এখনই উৎফুল্ল হবার কারণ নেই।

১৩৫৫

কবির জন্মদিনে

আজ যাঁকে জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্মরণ করছি তাঁকে আমরা কবিবর বলি না, মহাকবিও বলি না, শুধুই কবি বলি ; কারণ, যা যত বড় তার নাম ততই ছোট, যেমন দেশ কাল মন প্রাণ বিদ্যা বুদ্ধি। কবি শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ—ক্রান্তদর্শী, অর্থাৎ যাঁর কাছে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রকাশ প্রায়। এই অর্থ মনে রাখলে আর কোনও বিশেষণ যোগ করার দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজেকে এতই অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার কখনও অন্ত হবে না। লোকে তাঁর কৃতির যে অংশ নিয়ে সাধারণত চর্চা করে তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য। বাংলা পদ্য আর গদ্য রীতির যে পরিবর্তন মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ; তাঁর জন্যই আমাদের মাতৃভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষার আসন পেয়েছে ; তিনি জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—এই সব কথাই বার বার আমাদের মনে উদয় হয়। সাহিত্য বললে আমরা যা বুঝি তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং তার উপাদান অসংখ্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে একটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলছি।

যে দেশে যে ধর্ম প্রচলিত তার প্রভাব সে দেশের সাহিত্যের উপর অবশ্যই পড়ে। বাংলা সাহিত্যের বদনাম শোনা যায় যে এ কেবল হিন্দুরই সাহিত্য, সুতরাং অহিন্দু বাঙালীর অনুপযুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যের উপর খ্রীষ্টধর্ম ও বাইবেলের প্রভাব প্রচুর, তবুও তা সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত জনের প্রিয় হল কেন? এর কারণ, ইওরোপীয়

মধ্যযুগের অন্তে রেনেসাঁসের সময় পণ্ডিতগণ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছিলেন, সমগ্র ইওরোপের ঐতিহ্যকেই তাঁরা নিজের বলে গণ্য করেছিলেন। গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়েও তাঁরা অবাধে পেগান দেবদেবীর পুরাণকথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের ধর্মহানি হয় নি। পিউরিটান হয়েও মিলটন গ্রীক বাগ্‌দেবীর বন্দনা করেছেন। কেবল ধর্মবিশ্বাস দ্বারা সাহিত্য শাসিত হয় না— এই ধারণা হয়তো খুব স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ইওরোপের গুণী সমাজ বুঝেছিলেন যে জাতীয় সংস্কৃতির তথা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সাহিত্যে তার উল্লেখ থাকলেই ধর্মবিশ্বাসের হানি হয় না। হয়তো অনেকে মনে করতেন যে পেগান ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে তো খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যও আছে, তাতেই প্রথমটির দোষ খণ্ডন হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্মের গোঁড়ামি অনেকটা কমে গেছে, তার ফলে শিক্ষিত সমাজ পেগান ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য সমদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েও নির্ভয়ে পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কাব্য লিখেছিলেন। তিনি এই কাজ বিনা বাধায় করতে পেরেছিলেন, কারণ ধর্মান্তরিত হলেও তিনি পূর্বধর্মের প্রতি বিদ্বেষগ্রস্ত হন নি, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং তাঁর স্বধর্মীরা তাঁর রচনার কোনও খবরই রাখতেন না। তার পর রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ভাল হ'ক বা মন্দ হ'ক দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ফেলবার নয়, জাতীয় সভ্যতার ধারা বজায় রাখবার জন্য সাহিত্যে তাকে যথোচিত স্থান দিতে হবে, এবং স্থান দিলেই তার ফলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রশ্রয় পাবে এমন নয়। 'গোরা' গল্পের নায়কের মতে সমস্ত প্রাচীন সংস্কারই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং পানুবাবুর মতে সে সমস্তই বিষতুল্য

বর্জনীয়। এই দু রকম গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে উদার দৃষ্টিতে কি করে সাহিত্য রচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তাঁকে বাঁ দিক আর ডান দিক থেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে হয়েছে, কারণ সকল পাঠকের সাহিত্যিক উদার দৃষ্টি নেই।

ইওরোপীয় রাজনীতিকদের মুখে এখনও আমরা শুনতে পাই যে Christian ideal বা খ্রীষ্টীয় আদর্শ না মানলে কোনও রাষ্ট্রের নিস্তার নেই। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও যে মহৎ আদর্শ থাকতে পারে তা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন না। সেই রকম এদেশের অনেকে মনে করেন যে সনাতনী বা ইসলামী আদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ পুরাণাদি প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপযুক্ত স্থান দিয়েও সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপর টেনে এনেছেন এবং দেখিয়েছেন যে উৎকৃষ্ট ইওরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যকেও সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক করা যায়। এই লক্ষণের ফলেই রবীন্দ্রসাহিত্য অনেক অহিন্দু পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে। আশা করা যায়, এই পথে অগ্রসর হয়েই ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য সর্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় হতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে আধুনিক ও যুক্তিবাদী, তথাপি তাঁর কাব্য নাটক আর গল্পে এদেশের প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। তিনি লোকব্যবহারেও যে অনুরূপ যোগসূত্র রেখেছিলেন তার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ কীর্তি আর আভিজাত্যের গণ্ডি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখেন নি, কোনও আলাপপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেন, দেশের জনসমষ্টির তুলনায় তাদের সংখ্যা খুব কম; তথাপি শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অগণিত লোক তাঁর সঙ্গে

দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ একমুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। কার কোন্ বিষয়ে কতটুকু দৌড় তা বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে, অনেক সময় উপদ্রবও করেছে। তাঁর কাছে ঘোমটাবতী পল্লীবধূরও জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নিজেকে আবশ্যকমত প্রসারিত বা সংকুচিত করবার এই শক্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার একটি কারণ। ‘হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা’ —এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজ স্বভাবের এক দিকের পরিচয় দিয়েছেন।

১৩৫৫

বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু

ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল ধর্মমত। রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেক মনীষী পাদরীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন। তার পর রাজনীতির চাপে ধর্মের সমালোচনা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ফ্যাশন ও রুচি নিরন্তর বদলায়, কালক্রমে পুরনো বিষয়ও রুচিকর বা কৌতূহলজনক হতে পারে। এই বিশ্বাসে আধুনিক বিলাতী খ্রীষ্টীয় সমাজের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের কিঞ্চিৎ তুলনা করছি। হিন্দুর সম্বন্ধে যা লিখছি তা প্রধানত বাঙালীর উদ্দেশ্যে হলেও বহু অবাঙালী সম্বন্ধেও খাটে। সম্প্রতি 'হিন্দু' শব্দের অর্থ প্রসারিত হয়েছে—ভারত-জাত-ধর্মাবলম্বী সকলেই হিন্দু। এই প্রবন্ধে কেবল সনাতনপন্থী হিন্দু অর্থে 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ করছি।

রিলিজন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। হিন্দুধর্ম বললে যা বোঝায় তা ঠিক রিলিজন নয়, কিন্তু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম ধর্মকে রিলিজন বলা চলে। ক্রীড অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা মূলমন্ত্র না থাকলে রিলিজন হয় না। খ্রীষ্টধর্মের ক্রীড আছে, যথা—ট্রিনিটি বা ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যিশুর অলৌকিক জন্ম, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর ক্রুসারোহণ, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, মানুষের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিশুশরণের আবশ্যকতা, ইত্যাদিতে বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্মেরও ক্রীড আছে। অনেকে মনে করেন হিন্দুরও আছে, যথা—বেদ, জাতিভেদ, পুনর্জন্ম ও মূর্তিপূজায় আস্থা, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, ইত্যাদি। কিন্তু এর একটিও হিন্দুত্বের সুনির্দিষ্ট বা অপরিহার্য লক্ষণ

নয়। আমরা 'বেদবাক্য' বলি, কিন্তু তা কেবল কথার কথা। সাধারণ হিন্দু বেদের কোনও খবরই রাখে না, সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। আজকাল জাতিভেদ পুনর্জন্ম প্রভৃতি না মানলেও হিন্দুত্বের হানি হয় না। যে নিজেকে হিন্দু বলে, দু-একটি নৈমিত্তিক কর্ম (যেমন শ্রাদ্ধ) সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে, এবং যার সঙ্গে হিন্দু নামে খ্যাত অন্যান্য লোকের অল্পাধিক সামাজিক সম্বন্ধ থাকে সেই হিন্দু। আচারব্যবহার হিন্দুর লক্ষণ নয়। নিত্য নিষিদ্ধ খাদ্য খেলে, বিজাতীয় পোশাক পরলে, সিভিল বিবাহ বা মেম বিবাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে।

বিলাতের (ব্রিটেনের) অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্মের দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত—প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক। প্রথম শাখার লোকই বেশী, কিন্তু তাদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র চার্চ বা ধর্মসংঘ আছে। সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী সংঘ চার্চ অভ ইংলাণ্ড। বিভিন্ন প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ক্রীডের প্রধান অংশ এক হলেও খুঁটিনাটি নিয়ে বিবাদ আছে, সেজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গির্জা আলাদা, পাদরী-নিয়োগের পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু ক্যাথলিকদের দলাদলি নেই, বিলাতের তথা সকল দেশের ক্যাথলিক একই ধর্মসংঘের অন্তর্গত এবং ধর্মকর্মে পোপের শাসনই চূড়ান্ত বলে মানে।

ব্রিটিশ রাজ্যে সকল ধর্মাবলম্বী নানা বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করলেও চার্চ অভ ইংলাণ্ডের প্রতি কিছু পক্ষপাত করা হয়। পূর্বে এই সংঘ যে সরকারী অর্থসাহায্য পেত তা এখন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সংঘের সম্পত্তি নানাপ্রকার কর থেকে মুক্ত। চার্চ অভ ইংলাণ্ডের অনেক বিশপ হাউস অভ লর্ড্‌স-এ সদস্যরূপে আসন পান। ব্রিটেনকে লোকায়ত রাষ্ট্র বা secular state বলা চলে না, অন্তত

ভারতের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্বীকৃত হয়েছে বিলাত তেমন নয়। বিলাতের রাজাই চার্চ অভ ইংলাণ্ডের প্রধান, তাঁর অন্যতম উপাধি Defender of the Faith। পাকিস্তানী নেতারা যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলামী নীতির প্রতিষ্ঠা চান, ব্রিটিশ নেতারাও তেমনি বলে থাকেন যে Christian ideal না মানলে রাষ্ট্রের মঙ্গল নেই। বিলাতী রেডিওতে প্রত্যহ যে ধর্মকথা প্রচারিত হয় তা প্রধানত প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম, ক্যাথলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ প্রশ্রয় পান না। কয়েক বৎসর থেকে নাস্তিক, অজ্ঞাবাদী (agnostic) ও যুক্তিবাদী (rationalist) সম্প্রদায় তর্ক করছেন যে ব্রিটিশ প্রজা কেবল প্রোটেস্টাণ্ট নয়, কেবল খ্রীষ্টানও নয়। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নানা সম্প্রদায় বিলাতে বাস করে, তারা নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার পাবে না কেন? প্রবল আন্দোলনের ফলে কর্তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় অখ্রীষ্টান যুক্তিবাদী সম্প্রদায়কেও কিছু কিছু প্রচারের অধিকার সম্প্রতি দিয়েছেন। পাদরীরা তাতে মোটেই খুশী হন নি।

কয়েক বৎসর পূর্বেও বিলাতে রবিবারে থিয়েটার সিনেমা বল-নাচ ফুটবল-ম্যাচ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল, পাছে ওই দিনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। গত যুদ্ধের সময় সৈন্যদের আবদারের ফলে এই নিয়মের কড়াকড়ি এখন অনেকটা কমেছে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাদরী বাহাল থাকেন, সপ্তাহে একদিন উপাসনায় যোগ দেওয়া ও ধর্মকথা শোনা সৈন্যদের অবশ্যকর্তব্য। অবিশ্বাসী সৈন্যরা নিষ্কৃতি পেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক বাধা। সম্প্রতি বিলাতের সমস্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। যে শিক্ষক খ্রীষ্টধর্মে নিষ্ঠাহীন অথবা যিনি নিষ্ঠার ভান করতে পারেন না তাঁর চাকরির আশা অল্প।

বিলাতে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জন্য যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল চেষ্টা এবং নিষ্ঠাবান জনসাধারণের উৎসাহ দেখা যায়, ভারতের হিন্দুধর্মের জন্য সেরকম কিছু নেই। এদেশের গুরু ও পুরোহিতের সঙ্গে কতকটা মিল থাকলেও বিলাতী পাদরীদের প্রভাব আরও বেশী ও ব্যাপক। চার্চ অভ ইংলাণ্ড, স্কটিশ চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। এইসকল ধর্মসংঘের কর্তৃত্বেই পাদরীদের শিক্ষা, নিয়োগ, বদলি, শাসন, পদোন্নতি এবং বেতনের ব্যবস্থা হয়।

এদেশে ব্রাহ্মদের একাধিক সমাজ আছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম বলতে পারেন যে তিনি অমুক সমাজের। এই বিষয়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সনাতনপন্থী হিন্দুর পৃথক পৃথক সমাজ বা ধর্মসংঘ নেই। মঠ অনেক আছে, মঠের সম্পত্তি এবং উপাসকেরও অভাব নেই, কিন্তু মঠের নাম অনুসারে গৃহস্থ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক পরিচয় দেবার রীতি নেই। মঠ ও চার্চ একজাতীয় সংঘ নয়। এদেশের গুরু ও পুরোহিতদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হ'ক, তাঁরা স্বাধীন, কোনও সংঘের শাসন তাঁদের মানতে হয় না।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে উদাসীন হওয়া সহজ ছিল না। পইতা না থাকা এবং সন্ধ্যাবন্দনা না করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত গণ্য হত। অব্রাহ্মণকেও নানা রকমে অনুষ্ঠান পালন করতে হত। প্রকাশ্যে মুরগি খাওয়া চলত না, কিন্তু মদ খাওয়া মার্জনীয় ছিল। কুলগুরু এবং পুরোহিতদের প্রতিপত্তি এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু মঠধারী বা সন্ন্যাসী গুরুর বাহুল্য ছিল না। কালক্রমে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম ছাড়া হিন্দুকে কোনও কালেই কোনও রকম ক্রীড মানতে হয় নি এবং আজকাল অনেক অনুষ্ঠানও বর্জন করা

চলে। যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র—এ কথা আধুনিক খ্রীষ্টানকেও মানতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা বিষ্ণুর অংশ, কিংবা শুধুই মানুষ বা কাল্পনিক পুরুষ—আধুনিক হিন্দু যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে।

সেকালের তুলনায় একালের হিন্দুর অনেক অন্ধ সংস্কার দূর হয়েছে, কিন্তু এখনও যা আছে তা পর্বতপ্রমাণ। অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু ফলিত জ্যোতিষ ও মাতুলি-কবচে বিশ্বাস করে, তার প্রমাণ নিত্য নূতন নূতন রাজজ্যোতিষীর অভ্যুত্থান এবং খবরের কাগজে তাঁদের বড় বড় বিজ্ঞাপন। স্বামী, বাবা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদাতা গুরুর উদ্‌ভব হয়েছে, এঁদের শিষ্যও অসংখ্য। এই শিষ্যরা কেবল ধর্মকামনায় বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা শোকদুঃখে সান্ত্বনার জন্য গুরুবরণ করেন না ; অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের চাকরির উন্নতি, ভাল জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্তিও গুরুর অলৌকিক শক্তিবলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিছু কিছু গুরুর প্রভাব আছে, কিন্তু এখানকার মত ব্যাপক নয়। ব্রিটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ভাগ্যগণনা ও মাতুলি-কবচের ব্যবসায় প্রতারণারূপে গণ্য এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। কিন্তু আস্থাবান লোক সেখানেও কিছু আছে, তাদের জন্য গোপনে এই সকল ব্যবসায় চলে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এদেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধ বিশ্বাস বিলাতী শিক্ষিত সমাজের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু হিন্দুর সৌভাগ্য এই যে, ক্রীডের বন্ধন থেকে সে চিরকাল মুক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এডোআর্ড গিবন তাঁর বিখ্যাত

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true, by the philosopher as equally false and by the magistrate as equally useful. And thus toleration produced not only mutual indulgence, but even religious concord. ....The philosophers of antiquity ....viewing with a smile of pity and indulgence the various errors of the vulgar, practised the ceremonies of their fathers, devoutly frequented the temples of the gods; and sometimes condescending to act a part on the theatre of superstition, they concealed the sentiments of an atheist under the sacerdotal robes. Reasoners of such a temper were scarcely inclined to wrangle about their respective modes of faith or worship. It was indifferent to them what shape the folly of the multitude might choose to assume; and they approached with the same external reverence the altars of the Libyan, the Olympian, or the Capitoline Jupiter.

প্রাচীন রোমান ফিলসফারদের ধর্মমত সম্বন্ধে গিবন যা লিখেছেন তা অসংখ্য আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধেও খাটে। এই মিলের কারণ—রোমান ও হিন্দু নাগরিক দুইই পেগান ও ক্রীডশূন্য। সাধারণত দেখা যায়, পৌরুষেয় অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্মই ক্রীডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান ও শিখ ধর্মে ক্রীড আছে। কিন্তু অপৌরুষেয় ধর্ম, যেমন গ্রীক ও রোমানদের পেগান ধর্ম এবং সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রীডবর্জিত। যারা তেত্রিশ বা

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে এবং সেই সঙ্গে এক পরমাত্মাকে মানতেও যাদের বাধে না, তারা সহজেই মাঝে মাঝে পুরাতন দেবতা বর্জন এবং নূতন দেবতা গ্রহণ করতে পারে। অন্য ধর্মের প্রতি তাদের আক্রোশও থাকে না। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি এখন আর পূজা পান না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতার আসন পেয়েছেন, ভারতমাতা ও বঙ্গমাতাও দেবতারূপে গণ্য হয়েছেন। রূপকের আশ্রয়ে জন্মভূমিকে দুর্গা কমলা ও বাণীর সঙ্গে একীভূত কল্পনা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ, কিন্তু একেশ্বরপূজকের তা ক্রীডবিরুদ্ধ। এই কারণেই 'বন্দেমাতরম্' অন্যতর জাতীয় সংগীতরূপে গণ্য হয় নি, লোক ভোলাবার জন্য তাকে শুধু 'সমান মর্যাদা' দেওয়া হয়েছে। বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের খাসির মাংস অথবা খ্রীষ্টান ইউ-কারিস্ট সংস্কারে নিবেদিত রুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এসকল বস্তু খাদ্য মাত্র। কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমান এবং গোঁড়া ব্রাহ্মর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ খাওয়া সহজ নয়, তাঁরা মনে করেন এপ্রকার খাদ্যে পৌত্তলিক বিষ আছে, খেলে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

মধ্যযুগে ইওরোপে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তার ভিত্তি বাইবেল এবং আরিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। এই অদ্ভুত সমন্বয়ের বিরুদ্ধে কোনও খ্রীষ্টান কিছু বললে তার প্রাণসংশয় হত। ষোড়শ শতাব্দে ভিয়েনা নগরে সের্ভেটস নামে এক শারীরবিজ্ঞানী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতি সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁর আরও গুরুতর অপরাধ—বাইবেলে জুডিয়া প্রদেশের যে বর্ণনা আছে তার প্রতিবাদে তিনি বলেন, জুডিয়ায় দুগ্ধমধুর স্রোত বয় না, এ স্থান মরুভূমির তুল্য।

এ প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে—এই মত প্রকাশের জন্য গালিলিওকে কারাগারে যেতে হয়েছিল, অবশেষে তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় অন্যরকম লিখে অতি কষ্টে মুক্তি পেয়েছিলেন।

আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, যেমন—সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করে, বাসুকি বা দিগ্‌গজগণের মস্তকের উপর পৃথিবী আছে, ইত্যাদি। ষষ্ঠ শতাব্দে আর্যভট বলেছেন, পৃথিবীই আবর্তন করে। দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য বলেছেন, পৃথিবীর যদি কোনও মূর্তিবিশিষ্ট আধার থাকত তবে সেই আধারের জন্য অন্য আধার এবং পর পর অসংখ্য আধার আবশ্যক হত ; পৃথিবী নিজের শক্তিতেই আকাশে আছে। আর্যভট ও ভাস্করাচার্য ক্রীডহীন হিন্দুসমাজে জন্মেছিলেন তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁদের পুড়ে মরতে হয় নি।

বাইবেলের মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে জগতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঈশ্বর ছ দিনের মধ্যে আকাশ ভূমি পর্বত এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল তাঁর গ্রন্থে লিখলেন যে পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বৎসর। কিছুকাল পরে ডারউইন প্রচার করলেন যে বহুকালব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন জীব থেকে নব নব জীবের উৎপত্তি হয়েছে। লায়েল ও ডারউইনের উক্তিতে সর্ব শ্রেণীর খ্রীষ্টান (মায় বিলাতের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন) খেপে উঠলেন। তখন পাষণ্ডদের পোড়াবার রীতি উঠে গিয়েছিল তাই লায়েল ডারউইন ও তাঁদের শিষ্যরা বেঁচে গেলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে নূতন মত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে মান্যগণ্য বাইবেল-বিশ্বাসী অনেক আছেন যাঁরা

আধুনিক ভূবিদ্যা ও অভিব্যক্তিবাদ মানেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিল্যাণ্ডের কয়েকটি স্থানে বিদ্যালয়ে বাইবেল-বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি বিষয়ক অনেক কথা আছে। এদেশের কোনও গোঁড়া হিন্দু আবদার করেন নি যে স্কুল-কলেজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিজ্ঞান শেখানো বন্ধ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে হিন্দু উদারতা দেখায় নি, তার ফলে তাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ধর্মের মার্গবিচারে বা পারমার্থিক বিষয়ে তার বুদ্ধি সংকীর্ণ নয়, যত মত তত পথ—এই সত্য তার জানা আছে, সেজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মমতের বিরোধ অসম্ভব।

নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের সংখ্যা বিলাতে ক্রমশ কমছে। পাদরীরা খেদ করছেন যে গির্জায় পূর্বের মত লোকসমাগম হয় না, প্রতি বৎসরেই উপাসকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বহু শিক্ষিত লোক এখন কেবল নামেই খ্রীষ্টান, তাঁরা খ্রীষ্টীয় ক্রীড এবং বাইবেল-বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর উপর আস্থা হারিয়েছেন। অনেকে বুঝেছেন যে খ্রীষ্টের উপদেশে এমন কিছু নেই যা তাঁর পূর্বে আর কেউ বলেন নি, এবং যে সদ্‌গুণাবলীকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ বলা হয় তা খ্রীষ্টধর্মের একচেটে নয়। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। বাইবেল-ব্যাখ্যায় অনেক পাদরী এখন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ সাহস করে বলছেন যে ক্রীডে অলৌকিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ যা আছে তা বর্জন না করলে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষা পাবে না। কিন্তু সনাতনপন্থী খ্রীষ্টানদের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমে এলেও এখনও খুব আছে। সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের ডীন ইংগের উদার মতের জন্য তাঁর অনেক ভক্ত হয়েছে, কিন্তু গোঁড়ার দল তাঁর উপর খুশী নয়।

বার্মিংহামের বিশপ বার্নিজ তাঁর গ্রন্থে ক্রীড সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ণ ও অপ্রিয় কথা লিখেছেন। এঁরা প্রতিষ্ঠাশালী লোক, নয়তো চার্চ অভ ইংলাণ্ডের কর্তারা এঁদের পদচ্যুত করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য আজকাল বিলাতে প্রবল চেষ্টা হচ্ছে এবং অর্থব্যয়ও প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ দুটি রাজনীতিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—কমিউনিজম ও নাৎসিবাদ। এই দুই ধর্মে দেবতার প্রয়োজন নেই, ক্রীডই সর্বস্ব। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে অনেক কমিউনিস্ট ও নাৎসির সাদৃশ্য দেখা যায়। নাৎসিবাদ এখন মৃতপ্রায়, কিন্তু কমিউনিজম অন্য সকল ধর্মকে কালক্রমে গ্রাস করবে এমন সম্ভাবনা আছে। এর প্রতিকারের জন্য নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। আমাদের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভৃতি উন্নত জাতির অন্ধ সংস্কার অত্যন্ত অল্প। তথাপি ধর্মের মার্গবিচারে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি এখনও বাধামুক্ত হয় নি। বিজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় নগণ্য, আমাদের যান্ত্রিক ঐশ্বর্য অতি অল্প, অন্ধ সংস্কারেরও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতের ধর্মবুদ্ধি নিগড়বদ্ধ নয়। এদেশের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে যে নৈতিক দার্শনিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব আছে তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, প্রত্যেক হিন্দু নিজের রুচি অনুসারে ধর্মমত গঠন করতে পারে। কোনও চার্চ বা সংঘ তার উপর চাপ দিয়ে বলে না—দশ অবতার তোমাকে মানতেই হবে, গায়ত্রী জপতেই হবে, শিবরাত্রিতে উপবাস করতেই হবে, নতুবা তোমার হিন্দুত্ব বজায় থাকবে না।

ধর্মবুদ্ধির এই স্বাধীনতা—যা ক্রীডধারী খ্রীষ্টান প্রভৃতির নেই, এতে হিন্দুর কোন্ উপকার হয়েছে? বিশেষ কিছুই হয় নি। কালিদাস বলেছেন, গুণসন্নিপাতে একটিমাত্র দোষ ঢেকে যায়। এর বিপরীতও সত্য—রাশি রাশি ত্রুটি থাকলে একটি মহৎগুণ নিষ্ফল হয়ে যায়! হিন্দু যদি তার ত্রুটির বোঝা কমাতে পারে তবে তার স্বাধীন উদার ধর্মবুদ্ধি স্ফূর্তিলাভ করবে, তার ফলে একদিন হয়তো সে দ্বন্দ্বহীন মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজে পাবে,—অনুদার ক্রীডাশ্রয়ী ধর্ম বা ক্রীডসর্বস্ব রাজনীতিক ধর্মের পক্ষে যা অসম্ভব।

১৩৫৭

ভেজাল ও নকল

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।

বললাম, দেখ নন্দ দুধে অল্প স্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার বহু কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে, সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।

—নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।

—আজ্ঞে, এক পোর বেশী জল কোন দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।

এবারে বোধ হল নন্দ সত্য কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, একবারে খাঁটী দুধ কি দরে দিতে পার?

—আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।

—বরাবর খাঁটী দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?

—তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরিব লোক।

—আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম যত খুশী বাড়াতে পার কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?

—তা হলে তো ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।

—কিন্তু নামজাদা ডেয়ারির খাঁটী দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়।

অবজ্ঞার হাসি হেসে নন্দ বললে, খাঁটী কোথায়, মোষের দুধে জল মিশিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

—মনের কথা বলে ফেল নন্দ।

—তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হল ব্যবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেক্টারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছা-পোষা গরিব মানুষ, এ সব খরচ যোগাতে হবে তো!

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেক্টার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেক্টারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। অতএব এইসব সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্যে আরও জল দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেক্টার রাখলেও সর্বদা নির্জল দুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা নিজের চোখের সামনে দুইয়ে নিতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা।

শিউরাম পাঁড়ে এক কালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন

ব্যবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, বাবু, বঢ়িয়া ভঁইসা ঘিউ আনিয়েসি, সস্তা আছে, ছে টাকা সের, লিয়ে লিন।

ঘি খুব সাদা, শক্ত, একটু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ভেজাল কতটা দিয়েছ ?

—বনস্পতি ? আরে রাম রাম।

—দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা ব'লো না, পাপ হবে।

শিউরাম সহাস্যে বললে, গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মালুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পৌয়ার বেশী মিশাবে না।

—তার পর তুমি কত মিশিয়েছ ?

—সচ বাত বলছি বাবু, হামি সেরে এক পৌয়া মিশিয়েছি।

—চেহারা আর গন্ধ দেখে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।

—এ ছিয়া ছিয়া ! আপনে ভেজাল ঘিউ বানাবেন ?

—দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।

দুধ-ঘিএর কালবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। নকল দুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘিএর নকল আছে, কিন্তু শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটী ভঁয়সা ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ

ঘি-ব্যবসায়ীরা একটু নরম ঘনতেল (hydrogenated oil) কিনে তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একটু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁজ। চীনাবাদাম তিল তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অতি অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী তারা আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে অল্প গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায় ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অমুক অমুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাঁদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে * যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের চিরপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্য ? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম-যবের মিশ্র থেকে তৈরি হয়, না অন্য শস্যও তাতে

* রেশন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার সময় লিখিত।

থাকে ? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে ? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথর কুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না ? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুল-বিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হত ? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেধরা, শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ, প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। শুখনো মটর সবুজ রঙে ডুবিয়ে বস্তাবন্দী করা হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে ফুলিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা বিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটে অধ্যক্ষদের সামনেই এই অপবস্তু বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানারকম রং থাকে, তা নির্দোষ কিনা দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন ? সে উত্তর দেয়—

খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী আর মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুখিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ লবঙ্গ দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক (essential oil) বার করে নেবার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল আর নকল চলছে ঔষধে। কুইনীন এমেটিন আড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী ও বিলাতী ঔষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক ভদ্র গৃহস্থ জেনে শুনে এই পাপ ব্যবসায়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানেও এই কারবার অবাধে চলছে।

ভেজাল ও নকল এ দেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটী জিনিসের জন্য 'সাহেব-বাড়ি'র দারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত নীচতায় আমরা গ্লানি বোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জনসাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক কর্তব্যবোধ কম, একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার

উৎসাহ নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীর পুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল নকল কালো-বাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে পরম নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে। সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এইপ্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁরা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস বেচবার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অনুকল্প খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জনসাধারণ অবুঝ, অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হবে না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি আর মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে

সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু টাপিওকা প্রভৃতির উপযোগিতা প্রচার করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এইসব খাদ্যে জীবনরক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি সরকারী খবর প্রকাশিত হয়েছে যে কোন এক ল্যাবরেটরিতে ভুট্টা টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরির চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (ইণ্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা এখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম, অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা-টাপিওকা থেকে চাল তৈরি সেইরকম। সরকার যে বস্তুর কথা বলেছেন তাকে সিন্থেটিক রাইস বললে সত্যের অপলাপ হয়, তা ইমিটেশন রাইস বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন নকল সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত সেইরকম পদ্ধতিতে চালের মতন দানা তৈরি হচ্ছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে হয়তো দরিদ্র লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একবারে বর্জন করতে হবে। সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

১৩৫৭

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

সকল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রকার ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয় এবং অনর্থক বার বার দেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। যেমন লোকবিশেষের তেমনই জাতি বা শ্রেণী বিশেষেরও মুদ্রাদোষ আছে। দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা জানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিস দেয়। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলোয়—চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী মেয়ে নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে—সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বৃদ্ধদেরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অবৃদ্ধরা তা বলতে পারবেন।

জাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের ভাষায় সম্প্রতি যেসকল মুদ্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন শব্দদ্বৈত। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাচুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে।' তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন—গদ্‌গদ, বর্বর, জন্মজন্মনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দদ্বৈত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, হাড়ে হাড়ে—এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক। বুকে বুকে, কাঠে কাঠে—পরস্পর সংযোগ বাচক। সঙ্গে

সঙ্গে, পাশে পাশে—নিয়তবর্তিতা বাচক। চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া—দীর্ঘকালীনতা বাচক। অন্য অন্য, লাল লাল, যারা যারা, ঝুড়ি ঝুড়ি—বিভক্ত বহুলতা বাচক। টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে—প্রকর্ষ বাচক। যাব যাব শীত শীত, মানে মানে—ঈষদূনতা মৃদুতা বা অসম্পূর্ণতা বাচক। পয়সা টয়সা, বোঁচকা বুঁচকি, গোলা গুলি, কাপড়-চোপড়—অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক।

হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অল্পাধিক শব্দদ্বৈত আছে। বিদেশীর দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। শুনেছি, সেকালে চীনাবাজারের দোকানদার সাহেব ক্রেতাকে বলত, টেক টেক নো টেক নো টেক, একবার তো সী। একজন ইংরেজ পর্যটক লিখছেন, মাদ্রাজ প্রদেশে কোনও এক হোটেলে হুইস্কির দাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর পেয়েছিলেন—টেন টেন আনা ওআন ওআন পেগ। বিদেশীর কাছে যতই অদ্ভুত মনে হ'ক, শব্দদ্বৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না। কিন্তু যদি অনাবশ্যক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে দিয়ে বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক' বলেছেন সেই শ্রেণীর অনেক জোড়া শব্দ সম্প্রতি অকারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এগুলির বিশেষ লক্ষণ—জোড়ার শব্দদুটি অসমান কিন্তু প্রায় অনুপ্রাসযুক্ত এবং প্রত্যেকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ জোড়া শব্দও অনেক আছে, যেমন—মণি-মুক্তা, ধ্যান-ধারণা, জল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়-ক্ষতি, সুখ-সুবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি জোড়া শব্দ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রয়োগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি শব্দই যথেষ্ট। কেবল দুঃখ বা কেবল দুর্দশা, কেবল ক্ষয় বা

কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই রকম শব্দ যদি সর্বদাই জোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ।

দুজন সুস্থ সবল লোক যদি সর্বদা পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করে তবে দুজনেরই চলনশক্তির হানি হয়, একের অভাবে অন্য জন স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। প্রত্যেক শব্দেরই স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশশক্তি আছে যার নাম অভিধা। এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে করে যদি সর্বদা আর একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কাজ চলতে পারত সেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আজকাল জন-সাধারণের ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ভাল বা মন্দ, যে প্রয়োগ লোকে বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে আত্মসাৎ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে 'পরিস্থিতি, বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্যকরী উপায়,' ইত্যাদি শোনা যায়।

সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধূলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে বেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধূলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে— মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছি। খেলাধূলা দেখতে যাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলার সঙ্গে অনর্থক ধূলা যোগ করবার দরকার কি?

শব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম এখন নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে। শুধু নেতাজী রোড বা সুভাষ রোড করলে কিছুমাত্র অসম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর

লিখতে সুবিধা হত। সম্প্রতি ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের নাম নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে। শুধু নীলরতন কলেজ করলে কি দোষ হত? বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বদলে বঙ্কিমচন্দ্র বা বঙ্কিম স্ট্রীট করলে অমর্যাদা হত না। যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর দরকার হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ। কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে সাধারণে তাঁদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভক্তজন তাঁদের স্কন্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছেন। অনেকে মনে করেন প্রত্যেকবার নামোল্লেখের সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি রাজনারায়ণ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র না লিখলে তাঁদের অসম্মান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্রাট প্রভৃতি তুচ্ছ বিশেষণের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, দরকার হলে নামের পরিবর্তে তাঁকে শুধু কবি বা কবিগুরু আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়।

যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে। দারোয়ানের চৌগোঁপ্পা, পাগড়ি আর জমকালো পোশাক, ফিল্ড-মার্শালের ভালুকের চামড়ার প্রকাণ্ড টুপি, সন্ন্যাসী বাবাজীর দাড়ি জটা গেরুয়া আর সাতনরী রুদ্রাক্ষের মালা—এ সমস্তই মহিমা বাড়াবার কৃত্রিম উপায়। আধুনিক শংকরাচার্যদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি শংকরাচার্যের শ্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি শ্রীতেই তুষ্ট।

বাণ গৌড়ী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষরডম্বর। এই আড়ম্বরের প্রবৃত্তি এখনও আছে। অনেক বাক্যে অকারণে শব্দবাহুল্য এসে পড়েছে, লেখকরা গতানুগতিক ভাবে এই সব সাড়ম্বর বাক্য প্রয়োগ

করেন। 'সন্দেহ নাই'—এই সরল প্রয়োগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলছে—'সন্দেহের অবকাশ নাই'। 'চা পান' বা 'চা খাওয়া' চলে না, 'চা পর্ব' লেখা হয়। 'মিষ্টান্ন খাইলাম' স্থানে 'মিষ্টান্নের সদ্‌ব্যবহার করা গেল'। মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু যদি বার বার দেখা যায় তবে তা মুদ্রাদোষ।

শব্দের অপচয় করলে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে 'ব্যর্থ হইবে' লিখলে চলে সেখানে দেখা যায় 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে'। অনেকে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন', 'যোগ দিলেন' স্থানে 'অংশগ্রহণ করিলেন' বা 'যোগদান করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন' লেখেন। 'হিন্দীভাষী' লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেখা হয় 'হিন্দীভাষাভাষী'। 'কাজের জন্য (বা কর্মসূত্রে) বিদেশে গিয়াছেন'—এই সরল বাক্যের স্থানে দুরূহ অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়—'কর্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছেন'। ব্যপদেশের মানে ছল বা ছুতা। 'পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল' স্থানে লেখা হয়—'পূর্বাহ্ণেই…'। পূর্বাহ্ণের একমাত্র অর্থ সকালবেলা।

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বশে চলবার কোনও দরকার নেই—এই কথা অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিকৃত সংস্কৃতপ্রীতি দেখা যায়। বাংলা 'চলন্ত' শব্দ আছে, তবু তাঁরা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ 'চলমান' লেখেন, বাংলা 'আগুয়ান' স্থানে অশুদ্ধ 'অগ্রসরমান' লেখেন, সুপ্রচলিত 'পাহারা' স্থানে 'প্রহরা' লেখেন। বাকীর সংস্কৃত বক্রী নয়, পাঁঠার সংস্কৃত পণ্টক নয়, পাহারার সংস্কৃতও প্রহরা নয়।

অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ঝোঁক দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করেন। একজন গল্পকারের

লেখায় চার পৃষ্ঠায় পঁচিশ বার 'রীতিমত' দেখেছি। অনেকে বার বার 'বৈকি' লিখতে ভালবাসেন। কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্ভে 'হাঁ' বসান। আধুনিক লেখকরা 'যুবক যুবতী' বর্জন করেছেন, 'তরুণ তরুণী' লেখেন। বোধ হয় এঁরা মনে করেন এতে বয়স কম দেখায় এবং লালিত্য বাড়ে। অনেকে দাঁড়ির বদলে অকারণে বিস্ময়চিহ্ন (!) দেন। অনেকে দেদার বিন্দু (···) দিয়ে লেখা ফাঁপিয়ে তোলেন। অনাবশ্যক হস্-চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করা বহু লেখকের মুদ্রাদোষ। ভেজিটেবল ঘি-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে তাতে দেখেছি—'তিন্‌টি ডিম্‌ ভেঙ্গে নিন্‌, তাতে এক্‌টু নুন্‌ দিন্‌'।

আর একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রাদোষ বললে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচারব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তর ভাল জিনিস পেয়েছি। দু শ বৎসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথায় ও লেখায় কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কি বর্জনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

পাঁচ বছরের মেয়েকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—কুমারী দীপ্তি চ্যাটার্জি। সুশিক্ষিত লোকেও অম্লানবদনে বলে—মিস্টার বাসু (বা বাসিউ), মিসেস রয়, মিস ডাট। মেয়েদের নামে ডলি লিলি রুবি ইভা প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। যার নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখা Sheila। অনিল হয়ে যায় O'neil, বরেন হয় Warren। এরা স্বনামে ধন্য হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতাসূচক

তা খেয়াল হয় না। সংক্ষেপের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি না করে বন্দ্য করলে দোষ কি? সেই রকম মুখ্য চট্ট গঙ্গ্য ভট্টও চলতে পারে। সম্প্রতি অনেকে নামের মধ্যপদ লোপ করেছেন, নাথ চন্দ্র কুমার মোহন ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন। ভালই করেছেন। দিব্যেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন ফ্যাশন নয়। পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে ক্ষতি কি? মিস-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বৎসর পূর্বেও কুমারী সধবা ও বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌমার্য তো ঘোষণা করা হয় না।

প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের নাম আর. জি. কর কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—Better Bengal Society. বাংলা দেশ এবং বাঙালীর উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?

মেরুদণ্ডহীন অলস সুকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, সন্তানের নামকরণে তা প্রকাশ পায়। দোকানদারেরও স্বপনপসারী তরুণকুমার হবার সাধ হয়েছে। আমাদের পাড়ার একটি দরজীর দোকানের নাম—দি ড্রিমল্যাণ্ড স্টিচার্স। অন্যত্র স্বপন লণ্ড্রিও দেখেছি। তরুণ হোটেল, তরুণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এবং ইয়ং গ্র্যাজুয়েট নামধারী দোকান বিস্তর আছে। পাঁচ ছ বৎসর আগে বউবাজারে একটি দোকান ছিল—ইয়ং মোসলেম গ্র্যাজুয়েট ফ্রেণ্ড্স। একসঙ্গে তারুণ্য ইসলাম আর পাস করা বিদ্যার আবেদন।

১৩৫৭

যার দ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান হয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ আছে। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য। সাংখ্যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও আপ্তবাক্য (বা শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য। অন্যান্য দর্শনে আরও কয়েক প্রকার প্রমাণ মানা হয়।

প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference) এবং আপ্তবাক্য (authority)—এই ত্রিবিধ প্রমাণই আজকাল সকল দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে থাকেন। আপ্তবাক্যের অর্থ—বেদাদিতে যা আছে, অথবা অভ্রান্ত বিশ্বস্ত বাক্য। অবশ্য শেষোক্ত অর্থই বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীর গ্রহণীয়।

বিজ্ঞানী যখন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ ক'রে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য নির্ণয় করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করেন। যখন পূর্বনির্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে অন্য তথ্য নির্ধারণ করেন তখন অনুমানের আশ্রয় নেন; যেমন, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর গতির নিয়ম হতে গ্রহণ বা জোয়ার-ভাটা গণনা। বিজ্ঞানী প্রধানত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁকে আপ্তবাক্য অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হয়।

আদালতের বিচারকের কাছে বাদী-প্রতিবাদীর রেজেস্টারী দলিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি যখন সাক্ষীদের জেরা শুনে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তখন অনুমানের সাহায্য নেন। যখন কোনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত নেন, যেমন রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত, তখন তিনি আপ্তবাক্য আশ্রয় করেন।

Scientific mentality—এই বহুপ্রচলিত ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে বাংলায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলা যেতে পারে। এর অর্থ, গবেষণার সময় বিজ্ঞানী যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এবং সংস্কার ও পক্ষপাত দমন ক'রে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, সকল ক্ষেত্রেই সেই প্রকার বিচারের চেষ্টা। বিজ্ঞানী জানেন যে তিনি যা স্বচক্ষে দেখেন বা স্বকর্ণে শোনেন তাও ভ্রমশূন্য না হতে পারে, তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ এবং অপরাপর বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষে পার্থক্য থাকতে পারে। তিনি কেবল নিজের প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত মনে করেন না, অন্য বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষও বিচার করেন। তিনি এও জানেন যে অনুমান দ্বারা, বিশেষত আরোহ (induction) পদ্ধতি অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তার নিশ্চয় (certainty) সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। বলা বাহুল্য, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁরা সকলেই সমান সতর্ক বা সূক্ষ্মদর্শী নন।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যতটা ধ্রুব ও অভ্রান্ত গণ্য হত এখন আর তত হয় না। বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্প (hypothesis)ও ছিদ্রহীন না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। তাঁরা স্বীকার করেন যে সকল সিদ্ধান্তই সম্ভাবনা (probability)র অধীন। অমুক দিন অমুক সময়ে গ্রহণ হবে—জ্যোতিষীর এই নির্ধারণ ধ্রুব সত্যের তুল্য, কিন্তু কাল ঝড় বৃষ্টি হবেই এমন কথা আবহবিৎ নিঃসংশয়ে বলতে পারেন না।

চার পাঁচ শ বৎসর পূর্বে যখন মানুষের জ্ঞানের সীমা এখনকার তুলনায় সংকীর্ণ ছিল তখন কেউ কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ গণ্য হতেন। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। যিনি খুব শিক্ষিত তিনি শুধু দু-একটি বিষয় উত্তমরূপে জানেন, কয়েকটি বিষয় অল্প জানেন, এবং অনেক বিষয় কিছুই জানেন না। যিনি জ্ঞানী ও সজ্জন তিনি নিজের জ্ঞানের

সীমা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকেন, এবং তার বহির্ভূত কিছু বলে অপরকে বিভ্রান্ত করেন না।

বিজ্ঞানী এবং সর্ব শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। অনেকে মনে করে, অধ্যাপক ডাক্তার উকিল এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি বিশেষজ্ঞ 'জানি না' বলেন তবে প্রশ্নকারী ক্ষুণ্ণ হয়, কেউ কেউ স্থির করে এঁর বিদ্যা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণে যেসব বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার অধিকাংশ স্বাস্থ্যবিষয়ক, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল দেখা যায়।

তুচ্ছ অতুচ্ছ সরল বা দুরূহ যে সকল বিষয় সাধারণে জানতে চায় তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।—ধূমপানে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় কি না? পাতি বা কাগজি নেবু কোন্‌টায় ভাইটামিন বেশী? মিছরির ফুড-ভ্যালু কি চিনির চাইতে বেশী? রবারের জুতো পরলে কি চোখ খারাপ হয়? নূতন সিমেণ্টের মেঝে ঘামে কেন? উদয়-অস্তের সময় চন্দ্র সূর্য বড় দেখায় কেন? সাপ নাকি শুনতে পায় না? কেঁচো আর পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে কি না? দাবা খেললে আর অঙ্ক কষলে বুদ্ধি বাড়ে কি না? বাসন মাজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে গা শিউরে ওঠে কেন?

যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও হয় নি তার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হলেও তা অল্পশিক্ষিত লোককে বোঝানো যায় না, সরল প্রশ্নের উত্তরও অতি দুর্বোধ হতে পারে। যাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি সবগুলির উত্তর নাও জানতে পারেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারীকে যা তা বলে ভোলানো উচিত নয়। যদি উপযুক্ত উত্তর দেওয়ায় বাধা থাকে তবে

সরলভাবে বলা উচিত, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও নির্ণীত হয় নি,' অথবা 'প্রশ্নটির উত্তর বোঝানো কঠিন,' অথবা 'উত্তর আমার জানা নেই।' দুঃখের বিষয়, অনেকে মনে করেন, যা হয় একটা উত্তর না দিলে মান থাকবে না। উত্তরদাতার এই দুর্বলতা বা সত্যনিষ্ঠার অভাবের ফলে জিজ্ঞাসুর মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়। আমেরিকান লেখক William Beebe তাঁর 'Jungle Peace' নামক গ্রন্থে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন—These words should be ready for instant use by every honest scientist—'I don't know.'

প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করবার আগে যদি তন্ন তন্ন বিচার করতে হয় তবে জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ সতর্ক ও যুক্তি-পরায়ণ হয়ে থাকা সহজ নয়। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই নিত্য নৈমিত্তিক সংসারিক কার্যে অনেক সময় অপ্রমাণিত সংস্কারের বশে বা চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে চলেন। এতে বিশেষ দোষ হয় না যদি তাঁরা উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই সংস্কার ও অভ্যাস বদলাতে প্রস্তুত থাকেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের বাইরে আসেন তখন তিনিও সাধারণ লোকের মতন অসাবধান হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই অনেক সময় কুযুক্তি বা হেত্বাভাস আশ্রয় করেন। আবার সময়ে সময়ে অশিক্ষিত লোকেরও স্বভাবলব্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দেখা যায় এবং চেষ্টা করলে অনেকেই তা আয়ত্ত করতে পারেন। অল্পদর্শিতা অসতর্কতা ও অন্ধ সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের বিচারে যেরকম ভুল হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

যদুবাবু সুশিক্ষিত লোক। তিনি ব্ল্যাক আর্ট নামক ম্যাজিক দেখে এসে বললেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড! জাদুকর শূন্য থেকে ফুলদানি

টেবিল চেয়ার খরগোশ বার করছে, নিজের মুণ্ড উপড়ে ফেলে ছু হাত দিয়ে লুফছে, একটা নরকঙ্কালের সঙ্গে নাচতে নাচতে পলকের মধ্যে সেটাকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করছে। শত শত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? অলৌকিক শক্তি ভিন্ন এমন ব্যাপার অসম্ভব।' যদুবাবু এবং অন্যান্য দর্শকরা প্রত্যক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। রঙ্গমঞ্চের ভিতরটা আগাগোড়া কাল কাপড়ে মোড়া। ভিতরে আলো নেই, কিন্তু মঞ্চের ঠিক বাইরে চারি ধারে উজ্জ্বল আলো, তাতে দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগে। ভিতরে কোনও বস্তু বা মানুষ কাল কাপড়ে ঢাকা থাকলে অদৃশ্য হয়, ঢাকা খুললেই দৃশ্য হয়। জাছুকর কাল ঘোমটা পরলে তাঁর মুণ্ড অন্তর্হিত হয়, তখন তিনি একটা কৃত্রিম মুণ্ড নিয়ে লোফালুফি করেন। তাঁর সঙ্গিনী কাল বোরখা প'রে নাচে, বোরখার উপর সাদা কঙ্কাল আঁকা থাকে। বোরখা ফেলে দিলেই রূপান্তর ঘটে।

মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়ার কথা অনেক শোনা যায়। বিশ্বাসী ভক্তরা বলেন, 'অমুক বাবার দৈবশক্তি মানতেই হবে, শূন্য থেকে নানারকম গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন। আমার কথা না মানতে পার, কিন্তু বড় বড় প্রোফেসররা পর্যন্ত দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য তো অবিশ্বাস করতে পার না।' এইরকম সিদ্ধান্ত যাঁরা করেন তাঁরা বোঝেন না যে প্রোফেসর বা উকিল জজ পুলিস অফিসার ইত্যাদি নিজের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হতে পারেন, কিন্তু 'অলৌকিক' রহস্যের ভেদ তাঁদের কর্ম নয়। জড় পদার্থ ঠকায় না, সেজন্য বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে যা প্রত্যক্ষ করেন তা বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যদি ঠকাবার সম্ভাবনা থাকে তবে চোখে ধুলো দেওয়া বিদ্যায় যাঁরা বিশারদ (যেমন জাছুকর), কেবল তাঁদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হতে পারে।

রামায়ণে সীতা বলেছেন, ‘অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ’ —সাপের পা সাপেই চিনতে পারে তাতে সংশয় নেই। কিন্তু বিচক্ষণ ওস্তাদের পক্ষেও বাবা স্বামী ঠাকুর প্রভৃতিকে পরীক্ষা করা সাধ্য নয়, কারণ তাঁদের কাপড়-চোপড় বা শরীর তল্লাশ করতে চাইলে ভক্তরা মারতে আসবেন। বৈজ্ঞানিক বিচারের একটি নিয়ম—কোনও ব্যাপারের ব্যাখ্যা যদি সরল বা পরিচিত উপায়ে সম্ভবপর হয় তবে জটিল বা অজ্ঞাত বা অলৌকিক কারণ কল্পনা করা অন্যায়।

রামবাবু স্থির করেছেন যে বেলিণ্ডা জেলার লোকে চোর হয়, কারণ, তাঁর এক চাকর ওই জেলার লোক, সে ঘড়ি চুরি ক'রে পালিয়েছে। তার ভাগনে শ্যামবাবুর বাড়ি কাজ করে, সেও রোজ বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরায়। শ্যামবাবু বলেছেন, বেলিণ্ডা জেলার লোককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অল্প কয়েকটি ঘটনা বা খবর থেকে রামবাবু আরোহ (induction) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই জেলার সকলেই চোর।

তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন যে এই বৎসরে গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি এবং মহাগুরুনিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে, তাঁর আশি বছরের পিতামহীও মরেছেন। এই দুই আশ্চর্য মিল দেখে ফলিত জ্যোতিষের উপর গণেশবাবুর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। জ্যোতিষ গণনা কত বার নিষ্ফল হয় তার হিসাব করা গণেশবাবু দরকার মনে করেন না।

রত্নের সঙ্গে আকাশের গ্রহের সম্বন্ধ আছে, রত্নধারণে ভালমন্দ ফল হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়, অম্বুবাচীতে অন্য দিনের তুলনায় বেশী বৃষ্টি হবেই, অশ্লেষা মঘায় যাত্রা করলে বিপদ হয়, ইত্যাদি ধারণা বহু শিক্ষিত লোকেরও আছে। কিন্তু সত্যাসত্য

নির্ণয়ের যা যথার্থ উপায়—পরিসংখ্যান (statistics), তা এ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করেন নি।

বিপিনবাবু স্বজাতির উপর চটা। তিনি এক সভায় বললেন, বাঙালী অতি দুশ্চরিত্র। তার ফলে তাঁকে খুব মার খেতে হল। বিপিনবাবু এরকম আশঙ্কা করেন নি। পূর্বে তিনি আলাদা আলাদা কয়েকজনকে ওই কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে ধমক দিয়েছিল, কেউ তর্ক করেছিল, কেউ পাগল ভেবে হেসেছিল, কেউ বা বলেছিল, হাঁ মশায়, আপনার কথা খুব ঠিক। বিপিনবাবু ভাবতে পারেন নি, পৃথক পৃথক লোকের উপর তাঁর উক্তির প্রতিক্রিয়া যেমন হবে, সমবেত জনতার উপর তেমন না হতে পারে। তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করলে জানতে পারতেন, বস্তুর এক-একটি উপাদানের গুণ ও ক্রিয়া যেপ্রকার, বস্তুসম্ভারের গুণ ও ক্রিয়া সেপ্রকার না হতে পারে।

সাধারণ লোকের বিচারে যে ভুল হয় তার একটি কারণ, প্রচুর প্রমাণ না পেয়েই একটা সাধারণ নিয়ম স্থির করা। এককালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেই জরায়ুজ। কিন্তু পরে ব্যতিক্রম দেখা গেল যে duck-bill (ornithorhyncus) নামক জন্তু স্তন্যপায়ী অথচ অণ্ডজ। অতএব, শুধু এই কথাই বলা চলে যে অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব জরায়ুজ। ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, সাদা বেরালের নীল চোখ থাকলে সে কালা হয়। এখন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি, কিন্তু সাদা লোম, নীল চোখ আর শ্রবণশক্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণসম্বন্ধও আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব শুধু বলা চলে, যার লোম সাদা আর চোখ নীল সে বেরাল খুব সম্ভবত কালা।

মিত্র আর মুখুজ্জে কুটিল, দত্ত আর চট্ট বজ্জাত, কাল বামুন কটা

শূদ্র বেঁটে মুসলমান সমান মন্দ হয়—ইত্যাদি প্রবাদের মূলে লেশমাত্র প্রমাণ নেই, তথাপি অনেক লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশের অতি উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও ফলিত জ্যোতিষ আর মাদুলি-কবচে অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়। খবরের কাগজে 'রাজ-জ্যোতিষী'রা যেরকম বড় বড় বিজ্ঞাপন দেন তাতে বোঝা যায় যে তাঁরা প্রচুর রোজগার করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান ও দর্শনে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধটি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়া উচিত। তা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি।—

'কোনও একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কিনা এবং ঘটনাটা প্রকৃত কিনা তাহা…জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধান কার্যই বোধ করি তাঁর প্রধান কার্য। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। …অবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য।…তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না।…নিজের উপরেও তাঁর বিশ্বাস অল্প।… কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে…এই ভয়ে তিনি সর্বদা আকুল। ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান ততটুকু পান না। তাহার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান।…একটা ঘটনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র ঘটনায় যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণকঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

'একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে।...ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে।...পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে। যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ মিলিয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে, তেমন কিছুই নাই। হাজারের বদলে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।'

এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরেজী নাম begging the question, অর্থাৎ যা প্রশ্ন তাই একটু ঘুরিয়ে উত্তর রূপে বলা। প্রশ্ন—কাঠ পোড়ে কেন? উত্তর—কারণ, কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য মানে যা পুড়তে পারে। অতএব উত্তরটি এই দাঁড়ায়—কাঠ পুড়তে পারে সেইজন্যই

পোড়ে। প্রশ্নটিকেই উত্তরের আকারে সাজিয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন—ডাক্তারবাবু, নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন? উত্তর—তোমার dyspnoea হয়েছে। রোগের নাম শুনে রোগীর হয়তো ডাক্তারের উপর আস্থা বেড়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি হল না; নামটির মানেই কষ্টশ্বাস। আরও উদাহরণ—গাঁজা খেলে নেশা হয় কেন? কারণ, গাঁজা মাদক দ্রব্য। রবার টানলে বাড়ে কেন? কারণ, রবার স্থিতিস্থাপক। ডি-ডি-টিতে পোকা মরে কেন? কারণ জিনিসটি কীটঘ্ন। খবরের কাগজে এবং রাজনীতিক বক্তৃতায় এইপ্রকার যুক্তি অনেক পাওয়া যায়। যথা—'প্রজা যদি নিজের মতামত অবাধে ব্যক্ত করিতে না পারে তবে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হয়, কারণ, রুদ্ধ জনমত অশেষ অনিষ্টের মূল।'

অনেক সময় পূর্বের ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ মনে করা হয়। এরূপ যুক্তিই কাকতালীয় ন্যায় বা post hoc, propter hoc। আমার ফিক ব্যথা ধরেছে, একটা বড়ি খেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে গেল। এতে ঔষধের গুণ প্রমাণিত হয় না, ব্যথা আপনিও সারতে পারে। একটা নারকেল গাছ পুঁতেছিলাম, বার বৎসরেও তাতে ফল ধরল না। বন্ধুর উপদেশে এক বোতল সমুদ্রের জল গাছের গোড়ায় দিলাম। এক বৎসরের মধ্যে ফল দেখা গেল। এও প্রমাণ নয়, হয়তো যথাকালে আপনিই ফল ধরেছে। বার বার মিল না ঘটলে কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা প্রায়ই বলেন, যদি গণনা ঠিক হয় তবে মিলতেই হবে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরাও ব'লে থাকেন, যদি ঔষধনির্বাচন ঠিক হয় তবে রোগ সারতেই হবে। যদি শতবার অভীষ্ট ফল না পাওয়া যায় তাতেও তাঁরা হতাশ হন না; বলেন, গণনা (বা ঔষধ) ঠিক হয় নি। যদি একবার ফললাভ হয়

তবে উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এই দেখ, বলেছিলাম কিনা ? যথার্থ গণনার (বা ঔষধের) কি অব্যর্থ ফল !

সকলেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেজন্য অসংখ্য ক্ষেত্রে আপ্তবাক্য মেনে নিতে হয়। কার উপদেশ গ্রহণীয় তা লোকে নিজের শিক্ষা আর সংস্কার অনুসারে স্থির করে। পাড়ায় বসন্ত রোগ হচ্ছে। সরকার বলছেন টিকা নাও, ভটচাজ্যি মশায় বলছেন শীতলা মাতার পূজা কর। যারা মতি স্থির করতে পারে না বা ডবল গ্যারান্টি চায় তারা টিকাও নেয় পূজার চাঁদাও দেয়। বাড়িতে অসুখ হলে লোকে নিজের সংস্কার অনুসারে চিকিৎসার পদ্ধতি ও চিকিৎসক নির্বাচন করে। রেসে বাজি রাখবার সময় কেউ বন্ধুর উপদেশে চলে, কেউ গনৎকারের কথায় নির্ভর করে।

গত এক শ দেড় শ বৎসরের মধ্যে এক নূতন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে—বিজ্ঞাপন। অশিক্ষিত লোকে মনে করে, যা ছাপার অক্ষরে আছে তা মিথ্যা হতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মতন পরম জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে। একই বস্তুর মহিমা প্রত্যহ নানা স্থানে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চতুর বিজ্ঞাপক স্পষ্ট মিথ্যা বলে না ; আইন বাঁচিয়ে, নিজের সুনাম রক্ষা ক'রে, মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের প্রভাবে সাধারণের চিত্ত জয় করে। যে জিনিসের কোনও দরকার নেই অথবা যা অপদার্থ তাও লোকে অপরিহার্য মনে করে। অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিজ্ঞাপনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সাধারণের তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপন দেখে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়, অমুক স্নো মাখলে রং ফরসা হয়, অমুক তেলে ব্রেন ঠাণ্ডা হয়, অমুক সুধায়

নার্ভ চাঙ্গা হয়, অমুক ফাউণ্টেন পেন না হলে চলবে না, অমুক কাপড়ের শার্ট বা শাড়ি না পরলে আধুনিক হওয়া যাবে না। এক বিখ্যাত বিলাতী ব্যবসায়ী ঘোষণা করছেন—Beware of night starvation, খবরদার, রাত্রে যেন জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডে পিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনিও ভাবেন, তাই তো, রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খেয়েই শোয়া ভাল। চায়ের বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়—এমন উপকারী পানীয় আর নেই, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, কাজের আগে মাঝে ও পরে, শীত করলে, গরম বোধ হলে, সর্বাবস্থায় চা-পান হিতকর।

বিজ্ঞাপন কেমন পরোক্ষভাবে মানুষের বিচারশক্তি নষ্ট করে তার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহুকাল পূর্বের কথা, তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার পাশের টেবিলে একজন ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র একটা লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে তার সঙ্গে নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও কি হচ্ছে?' উত্তর দিলেন, 'এই কেশতৈলে মারকিউরি আর লেড আছে কিনা দেখছি।' প্রশ্ন—'কেশতৈলে ও সব থাকবে কেন?' উত্তর—এরা বিজ্ঞাপনে লিখছে, এই কেশতৈল পারদ সীসক প্রভৃতি বিষ হইতে মুক্ত। তাই পরীক্ষা ক'রে দেখছি কথাটা সত্য কিনা।' এই ছাত্রটি যা করছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম কাকদন্তগবেষণ, অর্থাৎ কাকের কটা দাঁত আছে তাই খোঁজ করা। পরে ইনি এক সরকারী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক হয়েছিলেন।

যেমন সন্দেশ রসগোল্লায়, তেমনি কেশতৈলে পারা বা সীসে থাকবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা। অজ্ঞ লোকে ভাববে, কি সর্বনাশ, তবে তো

অন্য তেলে এই সব থাকে ! দরকার কি, এই গ্যারান্টি দেওয়া নিরাপদ তেলটিই মাখা যাবে।

ধর্মমত আর রাজনীতিক মতের সত্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য। প্রমাণের অভাবে উত্তেজনা আর আক্রোশ আসে, মতবিরোধের ফলে শত্রুতা হয়, তার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মত সহজেই সর্বগ্রাহ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হলেও শত্রুতা হয় না। সোভিয়েট বিজ্ঞানী লাইসেংকোর প্রজনন বিষয়ক মত নিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে উগ্র বিতর্ক হয়েছে তার কারণ প্রধানত রাজনীতিক।

যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এইপ্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।

১৩৫৮

বাঙালীর হিন্দীচর্চা

পনর বৎসর পরে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে এই সংকল্প ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় অনেকে রাগ করেছেন, আরও অনেকে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী উদাসীন হয়ে আছেন। পনর বৎসর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, অতএব রাগের বশে হিন্দীকে বয়কট করা, ভয় পেয়ে নিরাশ হওয়া, অথবা পরে দেখা যাবে এই ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকা—কোনটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেউ কেউ মনে করেন, পনর বৎসর পরেও সরকারী সকল কার্য হিন্দী ভাষায় নির্বাহ করা যাবে না, তখন ইংরেজীর মেয়াদ আরও বাড়াতে হবে; হয়তো কোনও কালেই ইংরেজী-বর্জন চলবে না। এইরকম ধারণার বশে নিরুদ্যম হয়ে থাকাও হানিকর। অচির ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্র-ভাষা হবেই—এই সম্ভাবনা মেনে নিয়ে এখন থেকে আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য।

এ পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানত শুধু একটি ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছি—ইংরেজী। যাঁরা অধিকন্তু সংস্কৃত ফারসী ফ্রেঞ্চ জার্মন প্রভৃতি শেখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প। ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য তিনটি—জীবিকানির্বাহ, ভিন্নদেশবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, এবং নানা বিদ্যায় প্রবেশ লাভ। হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কেবল ইংরেজীর সাহায্যে জীবিকানির্বাহ চলবে না, সরকারী চাকরি, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তি, এবং সামরিক ও রাজনীতিক কার্যে হিন্দী অপরিহার্য হবে। ভারতের অন্যপ্রদেশবাসীর সঙ্গে প্রধানত হিন্দীতেই আলাপ করতে হবে। কিন্তু যাঁরা উচ্চশিক্ষা চান অথবা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যোগ রাখতে চান তাঁদের অধিকন্তু

ইংরেজীও শিখতে হবে। মোট কথা, এখন যেমন ইতর ভদ্র অনেক লোক ইংরেজী না শিখেও কৃষি শিল্প কারবার বা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, ভবিষ্যতে হিন্দী না শিখেও তা পারবে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যেসব বৃত্তিতে অভ্যস্ত তা বজায় রাখার জন্য হিন্দী শিখতেই হবে। তা ছাড়া অল্পাধিক ইংরেজীও চাই। অর্থাৎ, এক শ্রেণীর শুধু মাতৃভাষা আর এখনকার মতন নামমাত্র বাজারী হিন্দী জানলেই চলবে ; আর এক শ্রেণীর মাতৃভাষা ছাড়া ভালরকম হিন্দী এবং একটু ইংরেজী জানলেই চলবে ; এবং উচ্চশিক্ষার্থীর অধিকন্তু ইংরেজী উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হবে।

দুটির জায়গায় তিনটি ভাষা শিখতে হবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। গণিত বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করতে যে যত্ন নিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম যত্নে ভাষা শেখা যায়। হিন্দী আর বাংলার সম্পর্ক অতি নিকট, সে কারণে বাঙালীর পক্ষে হিন্দী শেখা সহজ। ইওরোপ আমেরিকা ও জাপানে বহু লোক তিন-চারটি বা ততোধিক ভাষা শেখে। যাঁরা রাজনীতিক বা বাণিজ্যিক দূত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে যান তাঁদের বিভিন্ন ভাষার দখল না থাকলে চলে না। যে বাঙালী এইপ্রকার পদের প্রার্থী তাঁকে বহু ভাষা শিখতেই হবে।

হিন্দীর আধিপত্যে আমাদের মাতৃভাষার ক্ষতি হবে এই ভয় একেবারে ভিত্তিহীন। ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ভাল মন্দ অনেক বাক্যরীতি বা ইডিয়ম বাংলায় এসে পড়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজী ভাব ও পদ্ধতি আত্মসাৎ করেই পুষ্ট হয়েছে, কিন্তু নিজের বিশিষ্টতা হারায় নি। হিন্দী দ্বারাও বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হবে, কিন্তু অভিভূত হবে না। অনেককাল থেকেই কিছু কিছু হিন্দী শব্দ বাংলায় আসছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে, কিন্তু তাতে বাংলার জাত যাবে না। বাংলা

থেকেও বিস্তর শব্দ হিন্দীতে যাচ্ছে। বাংলার তুলনায় ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি খুব বেশী, সেই কারণেই বাংলার উপর তার অসামান্য প্রভাব। হিন্দীর সে সমৃদ্ধি নেই, সেজন্য তার প্রভাব কখনও বেশী হবে না—রাজনীতিক মর্যাদা যতই থাকুক।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কেবল পাঠশালায় আর স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা পড়ানো হ'ত। তখনকার শিক্ষাবিধাতারা মনে করতেন, বাংলা তো আপনিই শেখা যায়, তার জন্য বেশী কিছু করতে হবে কেন। এই উপেক্ষা সত্ত্বেও সেকালের বাঙালী লেখক মাতৃভাষার উন্নতি করেছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁদের কীর্তির জন্যই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য কলেজেও শিক্ষণীয় হয়েছে। এখন বাংলা চর্চা করেই এম. এ., পি-এচ. ডি. উপাধি পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাওয়ায় বাংলা ভাষা জাতে উঠেছে, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পাঠ্যরূপে সমাদর পেয়েছে। কিন্তু কলেজী শিক্ষার গুণে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টার ফলে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের কোনও উন্নতি হয়েছে এমন বলা যায় না। সেকালের লেখকরা পাঠশালায় বা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতেই বাংলা শিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার শুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং নূতন লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। এখন অসংখ্য লেখক, তাঁদের অনেকে কলেজে বাংলা পড়েছেন। এখন রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে গেছে, আধুনিক প্রয়োজনে ভাষা নব নব ভাবের ধারক হয়েছে, তার প্রকাশ শক্তিও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সেকালে যে সতর্কতা ছিল, ইংলাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভাষার উপর যে শাসন আছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার একান্ত অভাব দেখা যায়।

সেকালের উপেক্ষা, একালের অসতর্কতা, এবং ইংরেজীর প্রবল প্রভাব—এই তিন বাধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব নেই, বাঙালী লেখকের সহজাত সাহিত্যপ্রীতি ও নৈপুণ্যের জন্যই বাংলা ভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে গণ্য হয়েছে। হিন্দীর প্রতিপত্তি যতই হ'ক তাতে বাংলা ভাষার অনিষ্ট হবে না।

যেসব সরকারী কর্মচারীর কর্মকাল শেষ হয়েছে বা শীঘ্র হবে তাঁদের হিন্দী না শিখলেও চলবে। যাঁরা যুবক, এখনও বহুকাল কর্মরত থাকবেন, তাঁদের অনেককেই হিন্দী শিখতে হবে, নতুবা তাঁদের উন্নতি ব্যাহত হবে। আর, যারা অল্পবয়স্ক তাদের সযত্নে হিন্দী শেখাতেই হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ প্রতিযোগে পরাস্ত না হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের আরম্ভকালে মুসলমানরা বাদশাহী জমানা আর ফারসী ভাষার অভিমানে ইংরেজীকে উপেক্ষা করেছিল। তার জটিল পরিণাম কি হয়েছে তা সকলেই জানেন। অন্ধ বিদ্বেষ বা অদূরদর্শিতার বশে হিন্দীকে উপেক্ষা করলে বাঙালীর অশেষ দুর্গতি হবে।

ভাগ্যক্রমে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উর্দু রাষ্ট্রভাষা রূপে নির্বাচিত হয় নি। সংবিধান সভায় যাঁরা হিন্দীর পক্ষে লড়েছিলেন তাঁরা এখন 'শুদ্ধ হিন্দী' অর্থাৎ সংস্কৃতশব্দবহুল হিন্দীর প্রতিষ্ঠার জন্য সোৎসাহে চেষ্টা করছেন। ভারতের প্রধান ভাষাগুলির যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী। হিন্দী ভাষায় যদি আরবী-ফারসী শব্দ কমানো হয় এবং সংস্কৃত শব্দ বাড়ানো হয় তবে দু-তিন কোটি উর্দুভাষীর অসুবিধা হলেও অবশিষ্ট বহু কোটি ভারতবাসীর সুবিধা হবে। হিন্দী ভাষার যদি 'ইম্‌তহান, দরখ্‌ত, পৈদাইশ, বনিস্‌বত, মুহব্বত, স্যাহী' ইত্যাদির পরিবর্তে 'পরীক্ষা, বৃক্ষ, উৎপত্তি, অপেক্ষা, প্রীতি, মসি' ইত্যাদি লেখা হয় তবে

বাঙালী আসামী ওড়িয়া গুজরাটী মারাঠী ও দক্ষিণ-ভারতবাসী সকলেরই বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫১ অনুচ্ছেদে আছে—হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য মুখ্যত সংস্কৃত থেকে এবং গৌণত অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করা হবে।

হিন্দী ভাষা একটা বোঝা হয়ে হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে এই ভেবে উদ্‌বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর একটা লাভের দিকও আছে, তা বাঙালী লেখকদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। ব্যবসায় বুদ্ধির যতই অভাব থাকুক একটি বিষয়ে বাঙালী এখনও এগিয়ে আছে। বাংলা সাহিত্য হিন্দী প্রভৃতির চেয়ে সমৃদ্ধ, পরিমাণে না হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। বাংলা কাব্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদির মর্যাদা যতই থাকুক, পাঠক বেশী নয়। কিন্তু পণ্য হিসাবে বাংলা গল্পগ্রন্থের আদর আছে। অনেক বাংলা গল্পের হিন্দী গুজরাটী তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, অনেক অবাঙালী সাগ্রহে মূল বাংলা গ্রন্থ পড়ে থাকেন। উদারস্বভাব অবাঙালী পাঠক বাংলা গল্পের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না।

ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা গল্পের উৎকর্ষ বাংলা ভাষার জন্য নয়, বাঙালী লেখকের স্বাভাবিক পটুতার জন্য। বাঙালী সাহিত্যিক যদি হিন্দী ভাষা আয়ত্ত ক'রে হিন্দীতে লেখেন তবে তাঁর পুস্তক সর্বভারতে প্রচারিত হবে, ক্রেতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। যাঁরা অল্প বয়স থেকে হিন্দী শিখছেন তাঁদের যদি ভবিষ্যতে শখ হয় তবে অনায়াসে হিন্দীতে গল্প লিখতে পারবেন। এর জন্য অপর প্রদেশের সমাজে মিশতে হবে, তাঁদের আচারব্যবহার জানতে হবে। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তা সুসাধ্য। যদি কেবল বাঙালী সমাজ নিয়ে হিন্দীতে গল্প লেখা হয় তা হলেও তার

ভারতব্যাপী কাটতি হবে। লেখকের ক্ষমতা আর পাঠকের রুচির সামঞ্জস্য করে বলা যেতে পারে যে, গল্পের পাত্র-পাত্রী যদি কতক বাঙালী আর কতক অন্যপ্রদেশবাসী হয় তবেই সব চেয়ে ভাল ফল হবে। যাঁরা বাংলা গল্প লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং বিহারী উত্তরপ্রদেশী প্রভৃতি সমাজের সঙ্গে পরিচিত, স্থবির না হলে তাঁরা হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে এই কাজে নামতে পারেন। ফরাসী জার্মন চেক হাঙ্গেরীয় পোল প্রভৃতি অনেক বিদেশী ইংরেজীতে লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের ভাষায় সময়ে সময়ে ভুল হয়, তার জন্য একটু আধটু উপহাসও সইতে হয়। কিন্তু রচনার গুণাধিক্যে তাঁদের ছোট ছোট ত্রুটি চাপা পড়ে যায়।

বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এঁদের জনকতক যদি হিন্দী লেখায় মন দেন তা হলে বাংলা সাহিত্য নিঃস্ব হবে না। এঁদের প্রভাবে হিন্দী ভাষাও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার নিকটতর হবে। নগেন্দ্র গুপ্ত, প্রভাত মুখো, এবং চারু বন্দ্যো তাঁদের অনেক গল্পে বিহারী ও উত্তরপ্রদেশী পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করেছেন। এইসকল গল্প হিন্দীতে লেখা হলে ভারতব্যাপী সমাদর পেত। উপেন্দ্র গঙ্গো, শরদিন্দু বন্দ্যো, বিভূতি মুখো এবং বনফুলের অনেক গল্পে অবাঙালী নরনারীর মনোজ্ঞ চিত্র আছে। এঁরা বহুকাল বাংলা দেশের বাইরে বাস করেছেন, সেখানকার সমাজের খবর রাখেন, অল্পাধিক হিন্দী জানেন, এবং সকলেই ভূরিলেখক। মাতৃভাষা চর্চায় ক্ষান্ত না হয়েও এঁরা মাঝে মাঝে মাতৃষ্বসার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

১৩৫৮

সাহিত্যিকের ব্রত

সাহিত্যের স্থূল অর্থ একজনের চিন্তা অনেককে জানানো। বিষয় অনুসারে সাহিত্য মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণী তথ্যমূলক, তার উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যার আলোচনা, স্থান কাল ঘটনা বা পদার্থের বিবরণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রচারমূলক, তার উদ্দেশ্য ধর্ম সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সংক্রান্ত মতের অথবা পণ্যদ্রব্যের মহিমা খ্যাপন। তৃতীয় শ্রেণী ভাবমূলক, রসোৎপাদন বা চিত্তবিনোদনই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তার সঙ্গে অল্পাধিক তথ্য আর প্রচারও থাকতে পারে। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের বিষয় ও ক্ষেত্র নিরূপিত, তাতে অবান্তর বিষয় আলোচনার স্থান নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীরও প্রতিপাদ্য ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অবান্তর প্রসঙ্গেরও সাহায্য নেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্দেশ্য রসোৎপাদন, কিন্তু ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, উপজীব্য অসংখ্য, সাধনের উপায়ও নানাপ্রকার। কাব্য নাটক গল্প এবং belles letters জাতীয় সন্দর্ভ এই শ্রেণীতে পড়ে। সেকালে কাব্য বা সাহিত্য বললে এইসব রচনাই বোঝাত। আজকাল কাব্যের অর্থ সংকুচিত হয়েছে, সাহিত্যের অর্থ প্রসারিত হয়েছে। এখনও সাহিত্য-শব্দ প্রধানত পুরাতন অর্থে চলে, তথাপি শেষোক্ত শ্রেণীর একটি নূতন দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা হলে ভাল হয়। বোধ হয় 'ললিত সাহিত্য' চলতে পারে।

সাধারণত রচনার প্রকৃতি বা বিষয় অনুসারে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন কবি, নাট্যকার, গল্প লেখক ইতিহাস লেখক, শিশুসাহিত্য লেখক, ইত্যাদি। এককালে কদাচিৎ জাতি অনুসারে

লেখককে বিশেষিত করা হ'ত, যেমন মহিলা কবি, মুসলমান কবি ; কিন্তু এখন আর তা শোনা যায় না। জীবিকা অনুসারেও লেখককে চিহ্নিত করার রীতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অন্নদাশংকর আর অচিন্ত্যকুমারকে হাকিম-সাহিত্যিকের শ্রেণীতে এবং তারক গঙ্গোপাধ্যায় কোনান ডয়েল আর বনফুলকে ডাক্তার-সাহিত্যিকের শ্রেণীতে ফেলা হয় না।

যিনি ললিত সাহিত্য লেখেন তাঁর বিশেষ বিশেষ মতামত থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য তাঁকে কোন মার্কা-মারা দলভুক্ত মনে করার কারণ নেই। লেখক নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগবলের প্রভাব মানতে পারেন, বিলাতী সভ্যতার পরম ভক্ত বা সোভিএট তন্ত্রের একান্ত অনুরাগী হতে পারেন, কিন্তু এই সব লক্ষণ অনুসারে ললিত সাহিত্যের উৎকর্ষ মাপা হয় না। লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু রসবিচারের সময় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সেকালের তুলনায় একালে ললিত সাহিত্যের উপজীব্য অনেক বেড়ে গেছে। স্বদেশী, রাজদ্রোহ, অসহযোগ, অগস্ট-বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগের আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড, বাস্তু-ত্যাগীর দুর্দশা, দেশব্যাপী অসাধুতা—সমস্তই কাব্য গল্প ও প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। সহৃদয় লেখক নরনারীর সাহস ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, অন্যায় দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নির্যাতন দেখে কাতর হয়েছেন, এবং বিগত ও বর্তমান ঘটনাবলী থেকে বীর করুণ বীভৎস ও ভয়ানক রসের উপাদান নিয়ে নিজের উপলব্ধিকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। এ প্রকার রচনার সঙ্গে লেখকদের রাজনীতিক মতের কোনও সম্বন্ধ নেই।

ললিত সাহিত্যের এই নিরপেক্ষতা সম্প্রতি ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ফাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘের উদ্ভব হয়েছিল। তার কিছুকাল পরে কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ গঠিত হয়। কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীদেরও সংঘ আছে। হিন্দু-মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজা-পার্টি থেকে লেখক-সংঘ গঠনের চেষ্টা হচ্ছে কিনা জানি না।

কাব্য নাটক বা গল্প অবলম্বন করে মতপ্রচারের রীতি নূতন নয়। এদেশের অনেক প্রাচীন কাব্যে দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। টমকাকার কুটীর এবং নীলদর্পণ একাধারে ললিত সাহিত্য ও প্রচারগ্রন্থ। বসন্তের টিকা না নেওয়ার পরিণাম কি ভয়ানক হতে পারে তা রাইডার হ্যাগার্ড ব্রিটিশ সরকারের ফরমাশে লেখা একটি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এমিল ব্রিও যৌন ব্যাধি সম্বন্ধে নাটক লিখেছেন। ইওরোপ আমেরিকার অনেক গল্প আর নাটকে সামাজিক ও রাজনীতিক মতের প্রচার আছে।

কোনও কাব্য নাটক বা গল্পে যদি মতবিশেষের সমর্থন থাকে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। ললিত সাহিত্যের লেখক অবসরকালে চা সিগারেট বা কেশতৈলের বিজ্ঞাপন লিখতে পারেন, কিংবা তাঁর গল্পের মধ্যেই অহিংসা কংগ্রেস-নিষ্ঠা হিন্দুজাতীয়তা বা কমিউনিস্ট আদর্শের প্রশংসা করতে পারেন। লেখক অলেখক নির্বিশেষে রাজনীতিক সংঘ, গোষ্ঠী বা ক্লাব গঠনের অধিকারও সকলের আছে। কিন্তু যাঁরা মতের লেবেল দিয়ে লেখকসংঘ গঠন করেন, সাধারণে তাঁদের একটু সন্দিগ্ধভাবে দেখে, মনে করে এঁদের চোখে রাজনীতির ধুলো লেগেছে, এঁরা সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ দৃষ্টি হারিয়েছেন।

রাজনীতিক নাম দিয়ে সাহিত্যসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা না গেলেও কিছু কিছু অনুমান করা যায়। সাহিত্যসেবীর দলবদ্ধ হয়ে

রাজনীতিক লেবেল ধারণ একরকম ব্রত। এই ব্রতধারীদের সংকল্প—এঁরা নিজ নিজ রচনার দ্বারা যথাসম্ভব দলীয় মতের প্রচার এবং বিপক্ষ মতের খণ্ডন করবেন। দল না বেঁধেও এঁরা এই কাজ করতে পারতেন, কিন্তু সংঘের অনুশাসন না থাকলে একনিষ্ঠ সমক্রিয়তা আসে না।

এই দলবন্ধনের ফলে প্রচারের সুবিধা হতে পারে। কিন্তু ললিত সাহিত্যের রচয়িতা পাঠক ও বিচারকের পক্ষে যে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত আবশ্যক তা লেবেলের জন্য ব্যাহত হয়। সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের গন্ধ এসে পড়ে, মনে হয় লেখকের স্বাধীনতা নেই, তিনি দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। যে পাঠক কমিউনিস্ট তন্ত্রের অনুরাগী তিনি কংগ্রেসী লেখকের রচনায় বুর্জোআ স্বার্থবুদ্ধি দেখতে পান। যিনি কংগ্রেসী পন্থায় বিশ্বাসী তাঁর কাছে মার্কা-মারা কমিউনিস্ট লেখকের রচনা অবোধ্য বা দুষ্ট অভিসন্ধি যুক্ত মনে হয়। যে লেখক দলভুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন তিনি পাঠকবর্গের কাছে অধিকতর সুবিচার পেয়ে থাকেন।

রাজনীতি ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যাতে দলগত বিবাদ নেই, যার সঙ্গে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, যার গুরুত্ব অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়েও বেশী। কালোবাজার, প্রতারণা, অমানুষিক স্বার্থপরতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও ছোট বড় যেসব পাপ আমাদের বর্তমান সমাজে মহামারীর মতন ব্যাপ্ত হচ্ছে তার প্রতিবিধানের জন্য সকল সাহিত্যিকই চেষ্টা করতে পারেন।

পূর্বে শোনা যেত যে আমাদের জাতিগত যত দোষ তার মূল হচ্ছে পরাধীনতা, দেশ স্বাধীন হলেই সকল দোষ ক্রমশ দূর হবে। স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু দোষ আগের চেয়ে বেড়েই চলেছে, যা পূর্বে ছিল না তাও দেখা দিয়েছে। এই দোষবৃদ্ধির এক কারণ আমাদের

রাষ্ট্রশাসনে অভিজ্ঞতার অভাব, তার চেয়ে বড় কারণ যুদ্ধজনিত জগদ্ব্যাপী বিপর্যয়। যে সব পাশ্চাত্ত্য জাতি বহুকাল স্বাধীনতায় অভ্যস্ত তাদেরও নৈতিক অধোগতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের মতন হয় নি। আসল কথা, আমরা যতই ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, আমাদের ধর্মবোধ অর্থাৎ সামাজিক কর্তব্যবোধ বহুকাল থেকেই ক্ষীণ, যেটুকু ছিল যুদ্ধের ধাক্কায় তাও নষ্ট হয়েছে, অনভ্যস্ত প্রভুশক্তি আর নব নব ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে দেশের অনেকে নিরঙ্কুশ স্বার্থসর্বস্ব হয়েছে, অনেক সাধু লোকও অভাবের তাড়নায় বা অপরের দৃষ্টান্তে অসাধু হয়েছে।

সকলের চোখের সামনে নিত্য যে সব অন্যায় ঘটছে তার প্রতিরোধের প্রয়োজন আজ সমস্ত রাজনীতিক বিবাদের উপরে। কংগ্রেস রাজত্বের বদলে সমাজতন্ত্রী হিন্দুমহাসভা কিষান-মজদুর-প্রজা বা কমিউনিস্ট শাসন এলেই আমাদের চরিত্র শুধরে যাবে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। আমাদের বর্তমান দুর্দশার অনেকটার জন্য আমরা দায়ী নই তা ঠিক, কিন্তু যে দোষ আমাদের প্রকৃতিগত তার প্রতিকার আমাদেরই হাতে, কোনও সরকারের তা দূর করার শক্তি নেই।

ধর্মের অর্থ সমাজহিতকর বিধি, ধর্মপালনের অর্থ সামাজিক কর্তব্যপালন। এই ধর্মবোধ লুপ্ত হওয়ায় সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে, অসংখ্য বীভৎস লক্ষণ সমাজদেহে ফুটে উঠেছে। ধনপতির তোষণ, দরিদ্রের শোষণ, কালোবাজারের প্রসার, সরকারী অর্থের অপব্যয়, উচ্চস্তরের কলঙ্ক চেপে রাখা, ইত্যাদি বড় বড় অপকীর্তির কথা অনেক পত্রিকায় থাকে, লোকের মুখে মুখেও রটনা হয়। কিন্তু যে সব অনাচার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে তার দিকে বিশেষ মন দেওয়া হয় না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকে সজ্ঞানে এবং আরও

অনেকে ভেড়ার পালের মতন অজ্ঞানে দুষ্ট লোককে ভোট দেয়। যে লোক দুষ্কর্ম ক'রে ধনী হয়েছে তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার জন্য সাধু লোকেও লালায়িত। অমুক অমুক দুষ্কর্ম ক'রে বড়লোক হয়েছে, তুমিই বা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে থাকবে কেন—এই রকম প্ররোচনা অনেক গৃহস্থ তাঁর পরিবারবর্গের নিকট পেয়ে থাকেন। ঘুষ দেওয়া আর নেওয়া চিরকালই ছিল কিন্তু এখন সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। ছাত্রেরা না পড়েই পাস করতে এবং গায়ের জোরে ডিক্‌টেটার হতে চায়। সরস্বতী পূজা আর দোলের সময় যে কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় তাতে মনে হয় আমরা বন্য জাতির সগোত্র। শহরের অনেক রাস্তা নৈশ পায়খানায় পরিণত হয়েছে। বাড়ির উপরতলা থেকে কাগজে মোড়া ময়লা অকস্মাৎ পথচারীর গায়ে এসে পড়ে। বোম্বাই আর মাদ্রাজের সঙ্গে কলকাতার রাস্তা বাজার খাবারের দোকান ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আমাদের পৌর নিগম কত অক্ষম, শহরবাসীর পরিচ্ছন্নতা বোধ কত অল্প। যে সব খ্যাতনামা পুরুষের মূর্তি দেশবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজ্ঞাপনের কাগজ এঁটে তার অপমান করা হয়, আমরা তাতে দৃক্‌পাত করি না; অবশেষে যখন স্টেট্‌সম্যান কাগজে এই অনাচারের খবর ছাপা হয় তখন আমাদের হুঁশ হয়। ভদ্র গৃহস্থ ঔষধ আর প্রসাধন দ্রব্যের আধার অতি সাবধানে লেবেল নষ্ট না করে তুলে রাখে এবং জালিয়াতের প্রতিনিধি ফেরিওয়ালার কাছে তা বেশী দামে বেচে। জাল ভেজাল আর নকল দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গুরুতর অপকীর্তির তুলনায় উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হয়তো তুচ্ছ, কিন্তু এইসব সামান্য লক্ষণ থেকেই বোঝা যায় যে সমাজের আপাদমস্তক ব্যাধিত হয়েছে।

আমরা এখনও নিজের অক্ষমতার জন্য ইংরেজ, কেন্দ্রীয় সরকার আর অন্যপ্রদেশবাসীকে গাল দিয়ে মনে করি আমাদের কর্তব্য শেষ

হয়ে গেল। ছেলেবেলায় একটি দেশপ্রেমের কবিতা পড়েছিলাম, তার কেবল প্রথম লাইনটি মনে আছে—মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন। তার পর যা আছে তার ভাবার্থ—সেই রাহুগ্রাসের পরেই ভারতের সুখসূর্য অস্তমিত হল। সাবুদ্দিন মহাপাপী হতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ সংহতিহীন ভারতবাসীর পাপ কত বড় লেখক তা বলেন নি। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত আমাদের রক্ষার ভার বিদেশীর হাতে ছিল, এখন আমরা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আত্মরক্ষা সকলকেই শিখতে হবে, আমাদের জোরেই সরকারের জোর—এই সত্য এখনও দেশবাসীর বোধগম্য হয় নি। আমাদের যে খ্যাতি আছে তা প্রতিঘাতসমর্থ শান্ত অহিংস বীরের খ্যাতি নয়, কাপুরুষের খ্যাতি। হিন্দু অতি নিরীহ, মার খেতেই জানে, বাঙালী কাঁদতেই জানে—তর্ক করে এইসব অপবাদ দূর করা যায় না, আচরণ দ্বারা খণ্ডন করতে হবে।

ব্যক্তিগত রাজনীতিক মত যাই থাকুক, আমাদের সকল লেখকই তাঁদের রচনা দ্বারা দেশব্যাপী মোহ আলস্য আর দুষ্প্রবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারেন। এর চেয়ে বড় ব্রত এখন আর কিছু নেই। জনকতক রাজনীতি নিয়ে বিতণ্ডা করুন, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকরা সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত করার চেষ্টা করুন। আমাদের প্রয়োজন—হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক—যাঁরা সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন। দু-তিন বৎসর পূর্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছোট প্রবন্ধে বিলাসী বাঙালীকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। মনে হয় প্রমথনাথ বিশীরও এই ধরণের লেখা পড়েছি। সম্প্রতি কবিশেখর কালিদাস রায় বর্তমান অবিনয় অসংযম আর অসামাজিকতা সম্বন্ধে একটি সার্থক

প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি প্রধানত ছাত্র আর অল্পবয়স্কের উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু তাঁর মৃদু বেত্রাঘাত আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের সকলেরই পিঠে পড়েছে।

১৩৫৮

ভারতীয় সাজাত্য

ভারতবাসী মুসলমানের বিরুদ্ধে এই নালিশ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে যদিও তাদের উৎপত্তি ও নিবাস এই দেশে এবং হিন্দুদের সঙ্গেই রক্তের যোগ বেশী তথাপি তারা আরব-ইরান-তুর্কিকে পিতৃভূমি এবং ওইসব দেশের লোককে নিকটতর আত্মীয় মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের ঐক্যই মিলনের প্রধান সেতু। মাতৃভূমি ভারতের সঙ্গে তারা সম্বন্ধ গণনা করে গজনির সুলতানদের আক্রমণকাল থেকে, তার আগেকার ভারতকে তারা স্বদেশ মনে করে না। এদেশের অন্যধর্মী লোকের সঙ্গে তাদের শুধু রাজনীতির সম্পর্ক আছে, সাজাত্য-বোধ এবং সংস্কৃতির যোগ নেই।

উক্ত নালিশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের বলতে পারে—তোমাদের আলাদা পিতৃভূমি নেই তথাপি তোমরা একটা কাল্পনিক পিতৃলোক বানিয়েছ এবং তা থেকেই ধর্ম আর সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছ। ভারতের যারা অতিপ্রাচীন অধিবাসী তাদের তোমরা অসভ্য অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষা করেছ। তোমরা প্রচার করে থাক যে ভারতীয় মুসলমান হিন্দুরই স্বজাতি, অথচ তাদের ম্লেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে রেখেছ, অপমানও করেছ। যাদের সঙ্গে তোমাদের বংশগত সম্পর্ক নগণ্য সেই আর্য জাতি এবং বেদ-পুরাণোক্ত ঋষিগণকেই তোমরা আপন জন মনে কর। কোনও ভারতীয় মুসলমান যদি নিজেকে সৈয়দ অর্থাৎ পয়গম্বরের বংশধর বলে তবে তোমরা মনে মনে হাস, অথচ তোমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরা অম্লান বদনে বলে থাকে যে তারা কশ্যপ ভরদ্বাজ শক্তি প্রভৃতি আর্য ঋষিদের গোত্রজাত, তোমাদের ক্ষত্রিয়রা মনে করে তারা চন্দ্র-সূর্যবংশের সন্তান। আসল কথা, আমাদের ধর্ম

ঐতিহ্য সংস্কার রুচি আদর্শ ও রীতিনীতি যেমন বহু অংশে বিজাতীয়, তোমাদেরও তেমনি। তফাত এই যে আমাদের ইতিহাসের একটা সুনির্দিষ্ট আরম্ভ আছে—ইসলামের অভ্যুদয়, কিন্তু তোমাদের তা নেই। সেজন্য পুরাকালে পিছিয়ে গিয়ে বেদ-পুরাণের উপকথার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা নিজেদের ইতিহাস খুঁজছ।

কোনও জাতি যদি চিরকাল অভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে বাস করে তবেই তার ধর্ম সমাজব্যবস্থা সংস্কৃতি ইত্যাদি স্বতন্ত্র ও অনন্যভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাধারণত তা দেখা যায় না, এক জাতির উপর অন্যান্য জাতির প্রভাব নানাভাবে এসে পড়ে। রক্তের মিশ্রণ, বিজাতির অধীনতা বা বিধর্ম গ্রহণ যদি নাও হয় তথাপি পরিবর্তন আসতে পারে। আরব জাতি মুসলমান হবার পরেও প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞান বিনা দ্বিধায় আত্মসাৎ করেছিল এবং মধ্যযুগের ইওরোপ আরবদের কাছ থেকেই গ্রীক বিদ্যা লাভ করেছিল। বর্তমান ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিসকল প্রধানত খ্রীষ্টান, পেগান গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে তাদের ধর্মগত যোগ নেই, বংশগত যোগও বিশেষ কিছু নেই, তথাপি তাদের সংস্কৃতির উপর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির অপরিসীম প্রভাব এসে পড়েছে। ইওরোপ আমেরিকার শিক্ষিত জন সকলেই স্বীকার করেন যে অতিপ্রাচীন বিভিন্ন জাতি থেকে তাঁদের উৎপত্তি হয়েছে, পশ্চিম এশিয়া থেকে তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম পেয়েছেন, গ্রীস রোম থেকে সভ্যতার বীজ স্বরূপ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যা পেয়েছেন, তাঁদের সংস্কৃতির অবশিষ্ট অংশ তাঁরা নিজের যত্নে এবং প্রতিবেশী জাতিদের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন।

সেকালের ভারতবাসী পুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে ও জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করত। ষাট-সত্তর বৎসর আগেকার বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়

ম্যাক্সম্যুলার প্রভৃতির লেখা পড়ে স্থির করেছিলেন যে আর্যাবর্তের অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় বাঙালী (বিশেষত ভদ্র বাঙালী) আর্যজাতি-সম্ভূত। ইংরেজ জার্মন তাঁদেরই প্রাচীন জ্ঞাতি, কিন্তু তারা ভ্রষ্ট আর্য, বৈদিক আর্যই আদি আর্য।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর আর্যতার মোহ দূর হয়েছে। জাতি-বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অনেকে এখন বুঝেছেন যে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলেই সংকর, অতিপ্রাচীন অস্ট্রাল মোঙ্গল ভূমধ্য প্রভৃতি জাতি থেকে তাদের উৎপত্তি, কিঞ্চিৎ নর্ডিক রক্তও কারও কারও দেহে আছে। এই সংকরত্ব সর্বত্র সমান নয়, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এবং বংশগতির নিয়মে ভারতবাসী নানাপ্রকার দেহলক্ষণ পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নরজাতি থেকে তারা শুধু দৈহিক উপাদান পায় নি, তাদের সংস্কার অর্থাৎ জাতকর্ম বিবাহ অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতির রীতি, নানাপ্রকার সামাজিক বিধিনিষেধ, ভারতীয় লিপি, জ্যোতিষ, দার্শনিক মত, কৃষিপদ্ধতি, বাস্তুকর্ম, মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি, লোহা-পাথর থেকে লোহা তৈরি, বন্য ঘোড়া বশ করে তার পিঠে চড়া আর রথে জোতা, কাপড় সেলাই করে জামা-ইজার তৈরি প্রভৃতি অসংখ্য প্রথা বিদ্যা আর কৌশল লাভ করেছে।

ভারতীয় হিন্দুর পৃথক পিতৃভূমি নেই, অর্থাৎ ভারতের বাইরে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে হিন্দুধর্ম প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল এবং যেখানে এখনও হিন্দু আছে। বৈদিক আর্যগণের আদিভূমি উত্তর-মেরুর কাছে বা চীন-তুর্কিস্থানে বা উত্তর-পারস্যে হতে পারে, কিন্তু এখন সেখানে হিন্দু নেই। মুসলমানের যেমন আরব ইরান তুর্কি আছে হিন্দুর সেরকম কিছু নেই, তার ফলে হিন্দুর সাজাত্যবোধ এবং সমস্ত ঐতিহ্য ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। হিন্দুর ধর্ম ভারতেই উৎপন্ন হয়েছে, তার উপাদান শুধু বেদ আর তন্ত্র নয়, বৌদ্ধ জৈন

মুসলমান খ্রীষ্টান এবং বহু আদিম জাতির ধর্মও তাকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুর রক্ত, সংস্কার, ধর্ম কিছুই অবিমিশ্র নয়। ভারতে উদ্‌ভূত অতি জটিল হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে গত দেড় শ বৎসরে ইওরোপীয় সংস্কৃতিরও যোগ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

স্বধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মচ্যুতির অকারণ আশঙ্কা জড়িত থাকে। গোঁড়া হিন্দু ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, কৃত্য-অকৃত্য, কাল-অকাল প্রভৃতি বিচার করে সাবধানে জীবনযাপন করে। মিথ্যা কথা, প্রতারণা বা পরস্বাপহরণে ধর্মচ্যুতি হয় না, কিন্তু গ্রহণের সময় খেলে বা বিধবাকে গহনা পরতে দিলে হয়। সাধুতার চেয়ে লোকাচার বড় এই ধারণা সকল ধর্মের গোঁড়া লোকের মধ্যে আছে। যারা স্মরণীয় কালের মধ্যে ধর্মান্তর নিয়েছে অথবা সমাজের এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠেছে তাদের মধ্যে পূর্বধর্মের ছোঁয়াচ লাগবার প্রবল আশঙ্কা দেখা যায়। পৌত্তলিকতা প্রতিরোধের জন্য মুসলমান ধর্মে যত কঠিন বিধি আছে খ্রীষ্টধর্মের কোনও শাখায় ততটা দেখা যায় না। এই সব বিধিনিষেধের আদিকারণ মুসলমান সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। এর মূলে এই আশঙ্কা থাকতে পারে যে পূর্ব-পুরুষদের উৎসববহুল সরস ধর্মের প্রতি লোকের একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ আছে, একটু অসতর্ক হলেই পতন হবে। হিন্দুর অনেক নিয়মের মূলেও হয়তো এই ধারণা আছে যে লঙ্ঘন করলেই অনার্যতার মোহময় পঙ্কে পড়তে হবে। শিক্ষিত বাঙালী খ্রীষ্টানদের মধ্যেও এই শুচিবাতিক দেখা যেত, কিন্তু এখন বোধ হয় কমে গেছে। এককালে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উপর অনেক সামাজিক নির্যাতন হয়েছে। দেশী খ্রীষ্টানদের উপর তেমন কিছু হয় নি, কারণ তাঁরা সাহেব পাদরীর আশ্রিত। অসহায় ব্রাহ্মরা আত্মরক্ষার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের সংশ্রব যথাসম্ভব পরিহার করতেন এবং স্বধর্মচ্যুতির ভয়ে পৌত্তলিকতার সকল

চিহ্ন এড়িয়ে চলতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিত হিন্দুর গোঁড়ামি আর অনুদারতা আজকাল অনেক কমে গেছে, ব্রাহ্মদেরও স্বতন্ত্রভাব এবং ধর্মচ্যুতির আতঙ্ক পূর্বের মতন নেই।

রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' পুস্তকে 'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের এই অর্থ দিয়েছেন—

হিন্দুসমাজে যে-সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে-ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন—

আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া। সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নয়। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া। তবে কি মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো? নিশ্চয়ই পারি।···বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীষ্টান, আর এক ভাই মুসলমান, ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনই দুঃসাধ্য নহে···কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর।···মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক অর্থে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে অর্থ এখন চলবার কোনও সম্ভাবনা নেই। হিন্দু শব্দের আধুনিক অর্থ দাঁড়িয়েছে—ভারতজাত-ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ জৈন শিখ ব্রাহ্ম সনাতনী —এরা হিন্দু, কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দু নয়। যদি এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার্থের প্রচলন নাও হত তথাপি কোনও মুসলমান হিন্দু নামের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইত না। রবীন্দ্রনাথ যে সাজাত্যবোধ কামনা করেছিলেন তা এখন 'ভারতীয়' নামের উপর গড়ে উঠতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে nationality বা সাজাত্যের কারণ —নিবাস, উৎপত্তি (origin), ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য (traditions), সংস্কৃতি ও স্বার্থের ঐক্য। কোনও রাষ্ট্রে এই ঐক্য পুরোপুরি না থাকলেও সাজাত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ঐতিহ্যের ঐক্য নেই, ধর্মও সমান নয় (প্রোটেস্টাণ্ট, ক্যাথলিক, ইহুদী), ভাষার ঐক্য প্রয়োজনের বশে হয়েছে। কানাডারও ওই অবস্থা, সেখানে ভাষারও ঐক্য নাই। সুইটজারল্যাণ্ডেও উৎপত্তি ভাষা আর ধর্ম সমান নয়। সোভিএট রাষ্ট্রে নিবাস আর স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর ঐক্য নেই, ধর্ম সেখানে দুর্বল সেজন্য গণ্য নয়। তথাপি এই সব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সাজাত্য লাভ করেছে। সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ভাষার যতই ভেদ থাকুক, প্রদেশের (রাজ্যের বা স্টেটের) মধ্যে ভেদ সর্বত্র নেই, পশ্চিমবঙ্গে মোটেই নেই, স্বার্থও সকলের সমান।

ভারত-পাকিস্তান বিরোধ মিটতে হয়তো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু ভারতী প্রজার মধ্যে প্রীতি ও সাজাত্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দেরি করা চলবে না। হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে এ কথা চাপা দিয়ে লাভ নেই। এই অপ্রীতির কারণ নিয়ে দুই পক্ষের অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। কার দোষ কত তার আলোচনা না করে

এখন মিলনের উপায় খোঁজাই দরকার। পরিবার গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র সর্বত্রই মিলনের সূত্র প্রধানত মানসিক বা ভাবগত—সমান মন্ত্র, সমান উদ্দেশ্য, সমান মন, সমান আকূতি। যদি ধর্ম সমান হয় এবং নিষ্ঠা মোহমুক্ত হয় তবে মিলন সহজেই হতে পারে। কিন্তু যেখানে ধর্ম পৃথক এবং নিষ্ঠা মোহগ্রস্ত সেখানে বিরোধ আসে। মধ্যযুগের ইওরোপে প্রায় সমস্ত বিরোধের মূলে ছিল ধর্মান্ধতা। সেই ধর্মান্ধতা এখন নেই, তার স্থানে এসেছে স্বার্থান্ধতা।

বেদ স্মৃতি কোরান শরিয়ত প্রভৃতিতে যা লেখা আছে তাই ধর্ম—এ কথা সত্য নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে লোকে যেমন আচরণ করে তাই তার ধর্ম। মূঢ় হিন্দুর ধর্মে বলে, মুসলমানেরা দেশের কণ্টক, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো না ; ভগবান কল্কী যথাকালে অবতীর্ণ হয়ে ধূমকেতুর ন্যায় করাল করবাল দিয়ে ম্লেচ্ছনিবহ সংহার করবেন। মূঢ় মুসলমানের ধর্মে বলে, কাফেরকে বধ করলে বা জোর করে কলমা পড়ালে বা তাদের মেয়ে কেড়ে নিলে পাপ হয় না, পুণ্যই হয়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে হিন্দুর ধর্মান্ধতা অনেক কমেছে, মুসলমানেরও ক্রমশ কমবে। সংস্কারমুক্ত হিন্দু মুসলমান যদি পুরোহিত আর মোল্লার আসন অধিকার ক'রে উদার ধর্মমত প্রচার করেন তবে শীঘ্রই সুফল দেখা দিতে পারে।

সাজাত্যের যে সকল কারণ পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। এই দুটির দ্বারা ধর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতির অনেক ঐক্য আছে, অনৈক্য যা দেখা যায় তার মূলে আছে ঐতিহ্যের ভিন্নতা। ঐতিহ্যের যদি সমন্বয় ও প্রসার হয় তবে সংস্কৃতির ভেদ কমে যাবে, ধর্মের নামে যে অপধর্ম চলছে তারও সংস্কার হবে।

ভারতের পরম্পরাগত যে ঐতিহ্য তাতে হিন্দু আর মুসলমানের

সমান অধিকার। ভ্রান্তির বশে মুসলমান তার পূর্বপুরুষদের এই ঋক্‌থ বর্জন করেছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় আর সাহিত্যে শুধু হিন্দুর ওয়ারিসী স্বত্ব নেই, তাতে শুধু বহু-দেববাদ আর পৌত্তলিকতা আছে একথাও সত্য নয়। মিশ্রণ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হতে পারে না। নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টানও সাগ্রহে গ্রীক রোমান ঐতিহ্য চর্চা করেন, এমন মনে করেন না যে পেগান শাস্ত্র পড়লে বা পেগান সংস্কৃতির চর্চা করলে তাঁর ধর্মনাশ হবে। মিশর ও ইরান দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের অমুসলমান পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও ঐতিহ্য আলোচনা করে গৌরব বোধ করেন, এ ভয় তাঁদের নেই যে এতে ইসলামের হানি হবে। বলা যেতে পারে যে পেগান গ্রীক আর রোমান এখন নেই, মিসরের বহু দেববাদীরাও লোপ পেয়েছে, ইরানের অতি প্রাচীন ধর্মের লেশমাত্র নেই, সেখানে জরথুস্ত্রপন্থী যারা আছে তারা সংখ্যায় নগণ্য ; সুতরাং এই সব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলে মুসলমানের আদর্শনাশের ভয় নেই। কিন্তু ভারত ? এখানে যে হিন্দুরা জলজীয়ন্ত হয়ে বর্তমান রয়েছে, পুরাকালের সমস্ত বিষয় আঁকড়ে ধরে আছে। মুসলমান যদি তার পূর্বপুরুষদের সম্পদে হাত দিতে যায় তবে মাছির মতন মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়বে।

এই যুক্তিহীন আতঙ্ক শিক্ষিত মুসলমানরা দূর করতে পারেন। হিন্দু যখন ভারতীয় বিদ্যার বা কলার চর্চা করে তখন নির্বিচারে করে না, তার আধুনিক রুচি আর শিক্ষা অনুসারেই করে। মুসলমানও তাই করবে। হিন্দুর দৃষ্টিতে যা অনবদ্য মুসলমান তা অবদ্য মনে করতে পারে। হিন্দুর বিশ্বাস থাকতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর চার হাত ছিল, তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মুসলমানের কাছে এসব কথা অশ্রদ্ধেয় হতে পারে, কিন্তু তার জন্য গীতা পড়া চলবে না কেন ? আরব্য উপন্যাস আর ওমর খৈয়াম পড়ে হিন্দু

আনন্দ পায়, সুফী সাহিত্য তার ভাল লাগে; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়েও মুসলমান আনন্দ পেতে পারে।

কয়েকজন উদারস্বভাব বাঙালী মুসলমান তাঁদের রচনার দ্বারা হিন্দুর চিত্ত জয় করেছেন। কবি কাইকোবাদ তাঁর একটি কাব্যে হিন্দু নায়িকার মুখে কালীর স্তব দিয়েছেন, তাতে কবির ধর্মনাশ হয় নি, উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সর্বজনপ্রিয় কবিতায় হিন্দু আর ইসলামী ভাবের সমন্বয় করে যশস্বী হয়েছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর লেখার নূতন ভঙ্গীর জন্য অল্প-কালের মধ্যে অসংখ্য পাঠকের প্রিয় হয়েছেন। তিনি নিজে যেমন সংস্কারমুক্ত বিশ্বনাগরিক তাঁর রচনাও সেই রকম; সংস্কৃত ফারসী আরবী ইংরেজী জার্মন প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ আর বাক্য চয়ন করে স্বচ্ছন্দ নিপুণতায় তাঁর লেখায় সন্নিবিষ্ট করেছেন।

মুসলমান এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলেই যথেষ্ট হবে না। ভারতের বাইরে থেকে মুসলমান যে ঐতিহ্য নিয়েছে যার ফলে তার সংস্কৃতি বিশেষ রূপ পেয়েছে, হিন্দুকে তা অবশ্যই জানতে হবে, নতুবা ব্যবধান দূর হবে না। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই এইপ্রকার পরস্পর পরিচয় আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারেন।

১৩৫৮

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যারা ইংরেজী জানে না বা অতি অল্প জানে। অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্থ লোক এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজী জানে এবং ইংরেজী ভাষায় অল্লাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। গুটিকতক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে, যেমন টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, ক্রোটন, জেব্রা। অনেক রকম স্থূল তথ্যও তাদের জানা থাকতে পারে, যেমন জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চাইতে অ্যালিউমিনিয়ম হালকা, লাউ কুমড়ো জাতীয় গাছে দু রকম ফুল হয়। এই রকম সামান্য জ্ঞান থাকলেও সুশৃঙ্খল আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর পাঠক ইংরেজী ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেজন্য বাংলা পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়। ছেলেবেলায় আমাকে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি পড়তে হয়েছিল। 'এক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইবে'—এর মানে বুঝতে বাধা হয় নি, কারণ ভাষাগত বিরোধী সংস্কার ছিল না। কিন্তু যারা ইংরেজী জিওমেট্রি পড়েছে তাদের কাছে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি সুশ্রাব্য ঠেকবে না, তার মানেও স্পষ্ট হবে না। যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত। আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজকার্যে দেশী পরিভাষা চালাচ্ছেন, তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন, কারণ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলায় বিজ্ঞান শেখে তখন ভাষার জন্য তার বাধা হয় না, শুধু বিষয়টি যত্ন করে বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে তাকে বেশী চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন তাকে পূর্ব সংস্কার দমন করে (অর্থাৎ ইংরেজীর প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত বর্জন করে) প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশী চেষ্টা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্‌যোগের এই ত্রুটি ছিল, যে তাঁরা একযোগে কাজ না করে স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন, তার ফলে সংকলিত পরিভাষায় সাম্য হয় নি, একই ইংরেজী সংজ্ঞার বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষা-সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কয়েক জন লেখক একযোগে কাজ করেছিলেন, তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।

পরিভাষা-রচনা একজনের কাজ নয়, সমবেত ভাবে না করলে নানা ত্রুটি হতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন খুব বড় নয়, আরও শব্দের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু দরকার মতন বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক রচনা চলতে পারে। যত দিন উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচিত না হয় তত দিন ইংরেজী শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত সমিতি বিস্তর ইংরেজী শব্দ বজায়

রেখেছেন। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজী নামই বাংলা বানানে চলবে, যেমন অক্সিজেন, প্যারাডাই-ক্লোরোবেনজিন। উদ্‌ভিদ ও প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজী (বা সার্বজাতিক, international) নামও বাংলায় চালানো যেতে পারে, যেমন ম্যালভাসী, ফার্ন, আরথ্রোপোডা, ইনসেক্টা।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলে কোনও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন। ইওরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য এবং সাধারণে তা সহজেই বোঝে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা তেমন নয়, বয়স্থদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতন গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য কালক্রমে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে এই অসুবিধা দূর হবে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি, অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। অনেক লেখক মনে করেন, ইংরেজী শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজী sensitive শব্দ নানা অর্থে চলে, যেমন sensitive person, wound, plant, balance, photographic paper, ইত্যাদি। বাংলায় অর্থভেদে বিভিন্ন শব্দ

প্রয়োগ করাই উচিত, যেমন অভিমানী, ব্যথাপ্রবণ, উত্তেজী, সুবেদী, সুগ্রাহী। Sensitized paper এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ অতি উৎকট, কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন। সুগ্রাহী কাগজ লিখলে ঠিক হয়।

অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage,—'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পৌঁছায় নি।' এরকম বর্ণনা বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু এঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয় নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction—'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না'। এ রকম মাছিমারা নকল না করে 'নাইট্রেজেনের কোনও পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।

অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন 'অমেরুদণ্ডী'র বদলে লেখা যেতে পারে—যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু 'আলোক-তরঙ্গ' এর বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছুমাত্র সহজ হয় না। পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনও বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয় তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকেরও অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্পপরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থলবিশেষে

ইংরেজী নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।

আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন— অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'দেশ'-এর অর্থ ভারত ইত্যাদি, অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা'—এখানে লক্ষণায় দেশের অর্থ দেশবাসীর। 'অরণ্য'-এর আভিধানিক অর্থ বন, কিন্তু 'অরণ্যে রোদন' বললে ব্যঞ্জনায় অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাধারণ সাহিত্যে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা, এবং উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভাল। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, রূপকও স্থলবিশেষে চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জন করাই উচিত। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক—এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী এই প্রবাদটি যে কত ঠিক তার প্রমাণ আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি—'অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।' এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর। সম্পাদকের উচিত অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া।

১৩৫৮

জীবনযাত্রা

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high thinking—এই বাক্যটি এককালে খুব শোনা যেত। এখন তার বদলে শোনা যায়—জীবনযাত্রার মান বা standard of living বাড়াতে হবে। এই দুই আপাতবিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত না করে জীবনযাত্রা কতটা সরল করা যায়? তার নিম্নতম মান কি?

গ্রীক সন্ন্যাসী ডায়োজিনিস একটা পিপার মধ্যে রাত্রিযাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং লোকে দয়া বা ভক্তি করে যা দিত তাতেই তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ত। এই রিক্ত জীবনযাত্রায় তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয় নি। বাংলায় 'উঞ্ছ' শব্দ হীন নীচ বা তুচ্ছ অর্থে চলে। কিন্তু এর মূল অর্থ—ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারীর অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে আছে—এক উঞ্ছব্রতী সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্রাহ্মণ ফলমূল জীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রবল নৈয়ায়িক' বুনো রামনাথের কথা লিখেছেন, যিনি বনের ভিতর ছাত্র পড়াতেন এবং সস্ত্রীক শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ইনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর কোনও অনুপপত্তি (অভাব) নেই।

যাঁরা নিস্পৃহ সন্ন্যাসী এবং যাঁদের পোষ্য কেউ নেই, অথবা যাঁদের পোষ্যবর্গ অত্যল্পে তুষ্ট, তাঁদেরও জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি বিষয়

আবশ্যক। সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আদ্য সাধন, যা না হলে উচ্চ চিন্তা জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় চাই। যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে রুগ্ন বা দুর্বল লোকে তা পারে না।

উচ্চ চিন্তা বা জ্ঞানচর্চা এবং সর্বভূতের হিতসাধন বা লোকসেবা—এই দুইএর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক তা নেই। একালের আদর্শ অনুসরণের জন্য যে অল্পতম জীবনোপায় বা necessaries of life আবশ্যক তাও বদলে গেছে, সেকালের উঞ্ছব্রত এখন অসাধ্য। যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা না হলে জীবনযাত্রা চলে না।

অত্যল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধারণ মানুষ ভোগবিলাস চায়। অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ চিন্তা ও সৎকর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। তথাপি দেখা যায়, ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকেই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়। এই কারণে সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা সর্ব দেশে সর্ব কালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে।

অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। আদর্শের অনুসরণ দূরের কথা, বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার অবসর নেই। কোনও লোক জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করুক বা না করুক, সে রাজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা মজুর যাই হ'ক, মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্য কতকগুলি বিষয় তার অবশ্যই চাই, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান কি? দেশভেদে শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ হবে। বৃত্তিভেদেও

কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের আহার অশ্রমিকের সমান হলে চলবে না। এই রকম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেনে নিয়েও সর্ব-সাধারণের জন্য জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? ফর্দ করে বা অঙ্কপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্তু জীবনযাত্রার যা প্রধান মাপকাঠি—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ, তার দ্বারা একটা স্থূল ধারণা করা যেতে পারে।

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের আধুনিক নাম বুর্জোআ) স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে। বিগত ষাট-সত্তর বৎসরে এই সমাজে জীবনযাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধের যে পরিবর্তন দেখেছি তা বিচার করলে হয়তো মান নির্ধারণের সূত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে ছিলাম। বিহারীর তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রায় আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন তাঁরও অন্নবস্ত্র আর বাসস্থানের অভাব হ'ত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো তক্তপোশ আর গোটা-কতক বেঢপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দূরে, বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হ'ত। লোকে কদাচিৎ ঔষধার্থে চা খেত। সিগারেট তখন নূতন উঠেছে, গুটিকতক বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্থরা প্রায় সকলেই তামাক খেত। সুগন্ধ মাথার তেল দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউণ্টেন পেন হাতঘড়ি ছিল না, যারা ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেট-

ঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জানা ছিল। আমোদের ব্যবস্থা—কালীপূজোর সময় শখের থিয়েটার, কালে ভদ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান গল্প তাস পাশা দাবার আড্ডা। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ত। বাংলা গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকৃষ্ট বইও লোকে সাগ্রহে পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের যাঁরা আজকাল কলকাতায় বা অন্য শহরে বাস করেন তাঁদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। এঁরা সেকালের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এঁদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন দুর্মূল্য হয়েছে এবং এঁরা অনেক বিষয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহার নিকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমোদের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর ধুতি পঞ্জাবিতে তুষ্ট নয়, দামী প্যাণ্ট আর নানা রকম শৌখিন জামা চাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই প্রসাধন দ্রব্য দরকার। মেয়েদের যেমন অন্তত এক গাছা চুড়ি পরতে হয় ছেলেদের তেমনি হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে কয়েকবার চা চাই। সস্তা গুড়ুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে চলে না। গ্রামফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের হালচাল জানবার জন্য রোজ একাধিক খবরের কাগজ পড়তে হয়।

নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অনুভূতি থেকে বলতে পারি—একালের তুলনায় সেকালে মধ্যবিত্তের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ—যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দূতীদের দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লড্ডু আর পানীয় খেলেন অমনি তাঁর মনে হ'ল যে এত দিন বৃথাই কেটেছে।

সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে যদি মন্ত্রবলে হঠাৎ একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়িভাড়া আর চাকর রাখার খরচ দেখে তিনি আঁতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানা রকম আধুনিক সুবিধা ও আরাম ভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে ফেলা হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল জিনিস খেয়ে বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু কলের জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক পত্রিকা, সেফটি ক্ষুর, কামাবার সাবান, অজস্র চা এবং ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তাঁর বয়স কম হয় তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরাঁর খাবার, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ, নাচ-গানের জলসা, দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হুল্লোড়, আর টাটকা রাজনীতিক খবরের অভাবে ছটফট করবেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি দেখা যেত, সাধারণের জন্য টেলিফোন ছিল না। তাতে বড় কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার বা ব্যবসাদার কোনও অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছু কালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন

অপরিহার্য হয়ে পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব অপরকেও রাখতে হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, রাশিয়া বিস্তর সামরিক বিমান করেছে অতএব আমেরিকাকেও করতে হবে। আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে অতএব রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলেই সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্লেনে না গেলে অনেকের চলে না। আজ যদি জনকতক ধনী হেলিকোপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্য অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগের জন্যই যে নূতন নূতন জিনিস অপরিহার্য হয়েছে এমন নয়, অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্যও হয়েছে। খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সরকার আইন করে ভূরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, মদের দামও খুব বেড়ে গেছে, কিন্তু উচ্চ সমাজের পার্টিতে বা আড্ডায় স্ত্রী-পুরুষের অল্পাধিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পয়সা খরচ করে বলনাচ শিখছে। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল তখন বিদেশী জিনিস ব্যবহারে যে সংকোচ এবং বিলাসিতায় যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে যা ছিল না বা থাকলেও যা আবশ্যক গণ্য হত না এখন তা অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের লোক 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি অনাবশ্যক গণ্য করা হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ বা জীবনোপায় দাঁড়ায়—যথোচিত (অর্থাৎ বাহুল্যবর্জিত) খাদ্য বস্ত্র আবাস, এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম আর পরিমিত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট ।···

আমেরিকায় এবং ইওরোপের অনেক দেশে জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখনও যা বড়মানুষি বা বাড়াবাড়ি, পাশ্চাত্ত্য দেশে তা necessary, যেমন, মোটরকার, রিফ্রিজারেটার, বিজলী-উনন, ধুলো-ঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল, মদ, টিনে রাখা খাবার, নানা রকম পোশাক, মুখ ঠোঁট আর নখের রং, নাচঘর, নাইট ক্লাব, ইত্যাদি। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে—এই উপদেশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার তুলনা করে কৃপাবশে এই কথা বলেন। জীবনযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হবে, এদেশের শ্রমিক অল্প বেতনে কাজ করে বিদেশী শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগ করবে না—এই স্বার্থবুদ্ধিও উপদেশের পিছনে থাকতে পারে।

ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়, সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। ইওরোপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় এদেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও বেশী। ব্রিটেনে নানা রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ কমছে, ধনীর জীবনযাত্রার মান নামছে।

এদেশের সরকারও আয়কর ইত্যাদির দ্বারা এবং বিদেশী বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্ বস্তু জীবনযাত্রার জন্য একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত বিচার হয় নি, এবং তদনুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার চেষ্টাও হয় নি।

সম্প্রতি এদেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীরা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থেকে অধঃপাতে যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি। তাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজার মধ্যে ভাগ করে দিলেও দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু দুর্নীতি যেমন সংক্রামক, বিলাসিতাও সেই রকম, সে কারণে উপেক্ষণীয় নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতার লোভ। এদেশের ভদ্রসন্তান শ্রমসাধ্য জীবিকা চায় না সেজন্য তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাস-বাসনা আছে কিন্তু সদুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটারি রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে নেবার বিশেষ সুবিধা নেই, ইতরভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহযবনিকার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে দরিদ্র সোভিএট প্রজা বিদেশী ধনী রাষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়।

পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে—want more, work more, earn more, অর্থাৎ আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর ; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, ক্রমশ জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের

শাস্ত্র উলটো কথা বলে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শান্তি আসে না, পৃথিবীতে যত ভোগ্য বিষয় আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই।

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ জনের মোটর গাড়ি আছে, প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেমা আছে, সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এত মাত্রা তড়িৎ, এত পাউণ্ড মাখন, এত পাউণ্ড সাবান, এত গ্যালন পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও তাই হওয়া উচিত—এই প্রকার অন্ধ আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন সামর্থ্য বুঝেই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্যক তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক সুবিধা এখন স্থগিত রাখতে হবে।

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানো হয় তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর (যেমন বস্ত্রের) দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয়। এই দুষ্টচক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে।

আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বস্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির শিক্ষা আমরা হৃদয়ংগম করেছি—এইসব কথা আত্মপ্রতারণা মাত্র। জাতীয় চরিত্রের সংশোধন না হলে আমাদের নিস্তার নেই। সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম পরিকল্পনা করছেন যার সুফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। এখন যারা অল্পবয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। তার জন্য এমন

শিক্ষক চাই যাঁর যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের অবস্থায় তুষ্ট। শুধু বিদ্যা নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল থেকে তিনি আচার ও বিনয় (discipline) শেখাবেন, মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় সদভ্যাস ও সৎকর্মের প্রেরণা দেবেন। আমাদের সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আবদার মঞ্জুর করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের মর্যাদা বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাঁর কাজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝবার মত দূরদৃষ্টি সরকার বা জনসাধারণের হয় নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত হয়ে আছেন।

১৩৫৯

জন্মশাসন ও প্রজাপালন

পুরাণে আছে, মানব বা দানবের পীড়নে বিপন্না বসুন্ধরা যখন ত্রাহি ত্রাহি রব করতে থাকেন তখন নারায়ণ কৃপাবিষ্ট হয়ে ভূভার হরণ করেন। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই পুরাণোক্তির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে —কোনও প্রাণিসংঘ যদি পরিবর্তিত প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে না পারে অথবা নিজের সমাজগত বিকারের প্রতিবিধান করতে না পারে তবে তার ধ্বংস হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মে পুরাকালের অনেক জীব এবং সমৃদ্ধ মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পৃথিবী এখন একসত্ত্বা, তার একটি অঙ্গ রুগ্ন হলে সর্ব দেহের অল্পাধিক বিকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেকালে এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগ অল্পই ছিল। নেপোলিয়নের আমলে প্রায় সমস্ত ইওরোপ যুদ্ধে লিপ্ত হলেও এশিয়া তাতে জড়িয়ে পড়ে নি। চল্লিশ বৎসর পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্র ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে তফাতে থাকত। চীন দেশে বা ভারতে দুর্ভিক্ষ হলে বিলাতের বণিক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হত কিন্তু জনসাধারণ তার জন্য উৎকণ্ঠিত হত না। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় প্রজার বিশেষ অনিষ্ট হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের এই পৃথগ্‌ভাব এখন লোপ পেতে বসেছে। জার্মনি আর জাপানে স্থানাভাব, জীবনযাত্রা ও শিল্পের উপাদানও যথেষ্ট নেই, তার ফলে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হল। ভারত আর এশিয়ার অন্যান্য স্থানের দারিদ্র্য দেখে আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে, পাছে সমস্ত প্রাচ্য দেশ কমিউনিস্টদের কবলে যায়।

বহু দেশের লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। কবি হেমচন্দ্রের ভারতভূমি ছিল 'বিংশতি কোটি মানবের বাস', এখন খণ্ডিত ভারতেরই লোকসংখ্যা ৩৬ কোটি এবং প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ বাড়ছে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২০ বৎসর আগে প্রায় ১৮৫ কোটি ছিল, এখন ২০০ কোটির বেশী হয়েছে। সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের প্রজাবৃদ্ধির হার অনেক বেশী, কিন্তু এক দেশে অন্নাভাব আর স্থানাভাব হলে সকল দেশের পক্ষে তা শঙ্কাজনক। পৃথিবীতে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ভূমি এবং খনিজ উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ যা আছে তার যথোচিত বিভাগ হলে সমস্ত মানবজাতির উপস্থিত প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু রাজনীতিক ও অন্যান্য কারণে তা অসম্ভব। ভারতের নানা স্থানে বাঙালী পঞ্জাবী ও সিন্ধী উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ব্রিটেন জার্মানি ও ইটালির বাড়তি প্রজাও অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় আশ্রয় পাচ্ছে, কিন্তু সেসব দেশে ভারতী বা জাপানী প্রজার বসতি নিষিদ্ধ। যেখানে প্রচুর তেল কয়লা প্রভৃতি খনিজ বস্তু বা খাদ্যসামগ্রী আছে সেখান থেকে মাল পাঠিয়ে অন্য দেশের অভাব অবাধে পূরণ করা যায় না। পৃথিবী একসত্ত্বা হলেও একাত্মা হয় নি।

প্রায় দেড় শ বৎসর পূর্বে মালথস বলেছিলেন, খাদ্যের উৎপাদন যে হারে বাড়ানো যেতে পারে তার তুলনায় জনসংখ্যা বেশী গুণ বেড়ে যাবে, অতএব জন্মশাসন আবশ্যক, নতুবা খাদ্যাভাব হবে। এদেশের অনেকে মনে করেন, লোকসংখ্যা যতই বাড়ুক তার জন্য আতঙ্কের কারণ নেই, যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার যোগাবেন। ভারতে ভূমির অভাব নেই, একটু চেষ্টা করলেই চাষবাসের যোগ্য বিস্তর নূতন জমি পাওয়া যাবে, জলসেক আর সারের ভাল ব্যবস্থা হলে ফসল বহু গুণ বেড়ে যাবে। আর জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ভাল নয় বটে, কিন্তু তার প্রতিকার সংযমের দ্বারাই করা উচিত, কৃত্রিম উপায়ের প্রচলন হলে ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রশ্রয় পাবে। এঁরা মনে করেন উপদেশ দিয়েই জনসাধারণকে সংযমী করা যেতে পারে।

যাঁরা দূরদর্শী জ্ঞানী তাঁরা এই যদ্‌ভবিষ্য নীতি মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। খুব চেষ্টা করলে কৃষিযোগ্য ও বাসযোগ্য জমি বাড়বে এবং খাদ্য বস্ত্র ও শিল্পসামগ্রীর অভাব মিটবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাদ্যবস্ত্রাদি বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। যদি বর্তমান হারে লোকসংখ্যা বেড়ে যায় তবে এমন দিন আসবে যখন এই বিপুলা পৃথিবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, বিজ্ঞানের চূড়ান্ত চেষ্টাতেও ফল হবে না। অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমায় নয়, ভাবী মহাযুদ্ধে নয়, গ্রহনক্ষত্রের সংঘর্ষেও নয় ; বর্তমান সভ্যসমাজের রীতি-নীতিতেই এমন বিকারের বীজ নিহিত আছে যার ফলে অচির ভবিষ্যতে মানবজাতি সংকটে পড়বে।

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র যদি স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে সর্ব মানবের হিতার্থে একযোগে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে সংকট নিবারিত হতে পারে। কিন্তু তার আশা নেই, সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই যথাসাধ্য স্বয়ম্ভর হতে হবে, প্রজাসংখ্যা আর জীবনোপায় (necessities of life)এর সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সংকট যে বহুদূরবর্তী নয় সে বিষয়ে দূরদর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নেই, কিন্তু তার স্বরূপ আর প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁরা এখনও বিশদ ধারণা করতে পারেন নি। সংকটের যেসব লক্ষণ ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার প্রতি-কারের সদুপায় বা কদুপায় যা হতে পারে তার একটা স্থূল আভাস দেবার জন্য দুটি কাল্পনিক দেশের বিবরণ দিচ্ছি—মনুজরাজ্য ও দনুজ-রাজ্য। মনে করা যাক দুই দেশেরই জনসংখ্যা পর্যাপ্ত, কৃষি ও বাসের যোগ্য ভূমি এবং জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক দ্রব্যও যথেষ্ট আছে, যদি আরও কিঞ্চিৎ প্রজাবৃদ্ধি হয় তাতেও অনটন হবে না।

মনুজরাজ্যে ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর

প্রজাই আছে। রোগপ্রতিষেধ চিকিৎসা শিক্ষাপ্রসার ও শিল্পপ্রসার, জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ইত্যাদি প্রজাকল্যাণের সকল চেষ্টাই করা হয়। কালক্রমে দেখা গেল প্রজাবৃদ্ধি অত্যধিক হচ্ছে। দেশের শাসকবর্গ কৃষি ও শিল্পবৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব নিশ্চিত উপায় আছে তাও জনসাধারণকে শেখাতে লাগলেন। শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে শীঘ্রই তা বহুপ্রচলিত হল, কিন্তু অশিক্ষিত ও দরিদ্র নিম্নশ্রেণী শিখতে চাইল না। শিক্ষিত জনের তুল্য তাদের চিত্তবিনোদনের নানা উপায় নেই, ইন্দ্রিয়সেবাই সর্বাপেক্ষা সুলভ বিলাস, তাতে কিছুমাত্র বাধা তারা সইতে পারে না। দশ-বিশ বৎসর পরেই দেখা গেল পূর্বের তুলনায় ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার কমে আসছে এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পূর্ববৎ বাড়ছে। শাসকবর্গ এর জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন না, মনে করলেন নিম্নশ্রেণীও কালক্রমে শিক্ষিত হয়ে ভদ্রজনের আচরণ অনুসরণ করবে। ভদ্রের সংখ্যা কমে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা বংশগত নয়, শিক্ষার ফলে ইতর জনও ভদ্রত্ব ও তদুচিত গুণাবলী লাভ করবে। একটা আশঙ্কা এই আছে যে সর্বসাধারণের মধ্যে জন্মনিরোধ প্রচলিত হলে ভবিষ্যতে প্রজাসংখ্যা অত্যন্ত কমে যেতে পারে। কিন্তু তার প্রতিকার সুসাধ্য, উপযুক্ত প্রচারের ফলে এবং বহু সন্তানবতীকে পুরস্কার দিলে জন্মের হার বেড়ে যাবে। ভবিষ্যৎ সৈন্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিটলার আর মুসোলিনি সেই চেষ্টা করেছিলেন।

মনুজরাজ্যে যথোচিত খাদ্য আবাস আর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় অকালমৃত্যু কমে গেল, লোকের আয়ু বাড়তে লাগল। জন্মশাসনের ফলে জনসংখ্যা যত কমবে আশা করা গিয়েছিল তা হল না। তা ছাড়া যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া কলেরা যক্ষ্মা প্রভৃতিতে এখন বেশী লোক মরছে না, শিশুমৃত্যু খুব কমে গেছে, লোকে অনেক কাল

বাঁচছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় বৃদ্ধরা আগের তুলনায় বেশী দিন খাটতে পারছে বটে, তথাপি বিস্তর অকর্মণ্য বৃদ্ধ সমাজের ভারবৃদ্ধি করছে। যারা জন্মাবধি পঙ্গু বা দুর্বল, যারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, সুচিকিৎসার ফলে তারাও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকছে এবং তাদের অল্প কয়েকজন কাজের যোগ্য হলেও অধিকাংশই সমাজের গলগ্রহ হয়ে আছে। সকল ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে, জন্মশাসনে অভীষ্ট ফল হচ্ছে না, অকর্মণ্য বৃদ্ধ আর পঙ্গুও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে। অবশেষে অতিপ্রজতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্থানাভাব খাদ্যাভাব বস্ত্রাভাব প্রভৃতি নানা অভাব প্রকট হয়ে উঠল, মনুজরাজ্যে মৎস্যন্যায়ের লক্ষণ দেখা গেল। বিজ্ঞ জন ভাবতে লাগলেন, এ যে হিত করতে গিয়ে অহিত হল! সেকালের অব্যবস্থাই ভাল ছিল, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী অচিকিৎসা শিশুমৃত্যু ইত্যাদির ফলে প্রজার অতিবৃদ্ধি হতে পারত না।

কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইএ সার্বজাতিক জন্মশাসন-সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীরাধাকৃষ্ণন বলেছেন, মানবের হিতার্থে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণই সভ্যতা। প্রাণিজগতে কারা বেঁচে থাকবে তা প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ব্যাধি বন্যা দুর্ভিক্ষাদি নিবারিত করে আমরা প্রজার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছি, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি, তার ফলে সংকট দেখা দিয়েছে। জন্মশাসন ভিন্ন এই সংকটের প্রতিকার হবে না। সম্প্রতি British Association for the Advancement of Science এর সভাপতি প্রোফেসর এ. ভি. হিল তাঁর ভাষণে বলেছেন—All the impulses of decent humanity....religion and traditions of medicine insist that suffering should be relieved. তার পর তিনি বলেছেন —In many parts of the world improved sanitation

and fighting of insect borne diseases lowered infantile death rates and prolonged span of life and led to vast increase of population....There is much discussion of human rights. Do they extend to unlimited reproduction, with a consequent obligation falling on those more careful? সমস্যা এই দাঁড়াচ্ছে—যদি যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু রোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা হয় এবং যথেষ্ট জন্মনিরোধ না হয় তবে জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। প্রোফেসর হিল অবশেষে হতাশ হয়ে বলেছেন—If ethical principles deny our right to do evil in order that good may come, are we justified in doing good when the foreseeable consequence is evil? অর্থাৎ হিতচেষ্টার পরিণাম যদি সমাজের পক্ষে অনর্থকর হয় তবে সে চেষ্টা কি আমাদের করা উচিত? মনুজরাজ্যের কর্ণধারগণ এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি।

দনুজরাজ্যের শাসকবর্গ সমাজহিতৈষী কিন্তু নির্মম। অল্প স্থানে যদি অনেক চারা গাছ উৎপন্ন হয় তবে ক্ষেত্রপাল বিনা দ্বিধায় অতিরিক্ত গাছ উপড়ে ফেলে দেয় যাতে বাকী গাছগুলির উপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক ঘোড়া গরু কুকুর ইত্যাদি সযত্নে পালন করে, কিন্তু অসাধ্য রোগ হলে অতি প্রিয় জন্তুকেও প্রায় মেরে ফেলে। ভারতবাসী গৃহপালিত জন্তুর তেমন যত্ন নেয় না, কিন্তু অকর্মণ্য রুগ্ন জন্তুকে মারতে তার সংস্কারে বাধে, যদিও কসাইকে গরু বাছুর বেচতে তার আপত্তি নেই। বহু বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর আজ্ঞায় তাঁর আশ্রমের একটি রোগার্ত বাছুরকে ইনজেকশন দিয়ে

মারা হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তার তীব্র নিন্দা করে লিখেছিলেন —গান্ধীজী বাছুরের কষ্টনাশের জন্য তাকে মারেন নি, নিজের কষ্টের জন্যই মেরেছেন। কৃষিচর্যায় সকল দেশেই যা করা হয়, পীড়িত ও বিকল জন্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে রীতি আছে, দনুজরাজ্যে মানুষের বেলাতেও তাই করা হয়। চিররুগ্ন পঙ্গু অক্ষম অসাধ্যরোগাতুর জরাগ্রস্ত এবং কুকর্মা লোককে সেখানে মেরে ফেলা হয়। বয়স বেশী হলেই যেমন কমচারীকে অবসর নিতে হয়, দনুজরাজ্যের বৃদ্ধদের তেমনি ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। অল্প-সংখ্যক হতভাগ্যদের সেখানে বাঁচতে দেওয়া হয়, যাতে ভাগ্যবান প্রজারা কিঞ্চিৎ করুণাচর্চার সুযোগ পায়। বহু দেশে যেমন মহাস্থবির হলেও রাজ্যপাল আর মন্ত্রীরা চাকরিতে বাহাল থাকেন, তেমনি দনুজ-রাজ্যে বাছা বাছা গুণী বৃদ্ধরা বেঁচে থাকবার লাইসেন্স পান। সেখানকার প্রজানিয়মন-পর্ষদ অর্থাৎ Board of Population Control জনসংখ্যার উপর কড়া নজর রাখেন। যদি তাঁরা দেখেন যে জন্মনিরোধের বহু প্রচলন সত্ত্বেও অভীষ্ট ফল হচ্ছে না, অথবা কোনও কারণে খাদ্যবস্ত্রাদির অত্যন্ত অভাব হয়েছে, তবে তাঁরা নির্মম-ভাবে প্রজাসংক্ষেপের যথোচিত ব্যবস্থা করেন। মোট কথা দনুজ-রাজ্যের একমাত্র লক্ষ্য—পরিমিতসংখ্যক প্রজার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধন, মমতা বা অনুকম্পা সেখানে প্রশ্রয় পায় না।

দনুজরাজ্যের প্রজারা তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট, কারণ তাতেই তারা অভ্যস্ত। তারা মনে করে, মনুজরাজ্যের শাসনপ্রণালী অতি সেকেলে আর অবৈজ্ঞানিক। সেখানে অযোগ্য জনকে বাঁচাতে গিয়ে সমগ্র সমাজকে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে, সুস্থ কর্মঠ প্রজার ন্যায্য প্রাপ্যের একটা বড় অংশ রুগ্ন অক্ষম অবাঞ্ছিত প্রজাকে দেওয়া হচ্ছে। পরিমিতসংখ্যক প্রজার পক্ষে যে জীবনোপায় পর্যাপ্ত হত, অপরিমিত

প্রজার অভাব তা দিয়ে পূরণ করা যাচ্ছে না। ভ্রান্ত নীতির ফলে সেখানে সমাজের সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে মনুজরাজ্যের লোকে মনে করে, দনুজরাজ্যের শাসকবর্গ ধর্মভ্রষ্ট ইহসর্বস্ব নরপিশাচ, সেখানকার প্রজারা মানুষাকৃতি পিপীলিকা।

চণ্ডীদাস বলেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য। মহাভারতে হংসরূপী প্রজাপতির উক্তি আছে—গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—এই মহৎ গুহ্য তত্ত্ব তোমাদের বলছি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। ভারতের এই প্রাচীন মানুষবাদ এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য humanism কি একই? মানুষ কারা? কার দাবি আগে, আমার প্রিয়জনের, না আদর্শরূপে কল্পিত প্রবাহক্রমে নিত্য মানবসমাজের? মহাভারতে সনৎকুমারের বাক্য আছে—যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতং সত্যং মতো মম—যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য (অবলম্বনীয়)। এই জীবগণ কারা? Greatest good of the greatest number—বেন্থামের এই উক্তি আর সনৎকুমারের এই উক্তি কি সমার্থক? মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছেন—ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ—ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এজন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। প্রজা যদি অত্যধিক হয় তবে কোন্ ধর্ম তাদের ধারণ করবে? যারা সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত এবং পরিমিত মাত্রায় বংশরক্ষা করে তারা আগাছার মত উৎপন্ন অপরিমিত প্রজার ভার কত কাল বইবে? ভাগবতে রন্তিদেব বলেছেন—কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্—এই কামনা করি যেন দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের কষ্ট দূর হয়। প্রজার অতিবৃদ্ধি হলে দুঃখতপ্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের কষ্টলাঘবের জন্য সুস্থ প্রজা কতটা স্বার্থত্যাগ করবে?

প্রাচীন ধর্মজ্ঞগণ যা চাইতেন আধুনিক সমাজহিতৈষীরাও তাই চান—মানুষের অত্যন্ত হিত হ'ক, দুঃখার্তদের কষ্ট দূর হ'ক। কিন্তু সমস্যা এই—অবাধ প্রজাবৃদ্ধি এবং অযোগ্য প্রজার বাহুল্য হলে সমগ্র সমাজ ভারাক্রান্ত ও ব্যাধিত হয়। সকলের হিত করতে গেলে প্রত্যেকের ভাগে অল্পই পড়ে, অগণিত হতভাগ্যের প্রতি দয়া করতে গেলে সুস্থ সবল ও সুযোগ্য প্রজারা তাদের ন্যায্য ভাগ পায় না। অতএব জন্মশাসন অবশ্যই চাই। সংযম অথবা স্বাভাবিক বন্ধ্যকাল (safe period) পালনের উপদেশ দিলে কিছুই হবে না, কারণ অধিকাংশ মানুষ পশুর তুলনায় অত্যধিক অসংযমী। গর্ভাধান রোধের যেসব সুপরীক্ষিত নিশ্চিত ও নিরাপদ উপায় আছে তাই শেখাতে হবে। কিন্তু যদি জন্মশাসনেও অভীষ্ট ফল না হয় তবে সমাজরক্ষার জন্য ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে।

সমাজের সংকট ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে, মামুলী ব্যবস্থায় তা বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অশুভস্য কালহরণম্ নীতি গ্রহণ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে অশুভ দ্রুতবেগে এগিয়ে আসবে। যে ধর্ম সমাজকে ধারণ করে, প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত করে, এবং দুঃখতপ্তগণের আর্তিনাশ করে, বর্তমান ও ভবিষ্য কালের উপযোগী সেই সমঞ্জস ধর্মের তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, কিন্তু তার অন্বেষণে উপেক্ষা করা চলবে না।

১৩৬০

বাংলা ভাষার গতি

বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড় শ বৎসর আগে, গদ্য রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যময়, তাতে নবরসের প্রকাশ হতে পারলেও সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ত না। গদ্য বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিলাতী ইতিহাসে যেমন এলিজাবেথীয় ভিক্টোরীয় ইত্যাদি যুগ, সেই রকম বাংলা সাহিত্যিক ইতিহাসের কাল বিভাগের জন্য বলা হয় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনও প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয় নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র সাহিত্যশাসক ছিলেন, তাঁর আমলে লেখকরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, সেজন্য তৎকালীন সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যধিক প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনও রচয়িতার ব্যক্তিত্ববিকাশের হানি হয় নি। তাঁর তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের যে অংশ বহিরঙ্গ বা ভাষার আকৃতিগত তারই কিছু আলোচনা করছি।

চলিতভাষার প্রসার

চলিতভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ বোধ হয় হুতোম পেঁচার নক্শা। অনেকে বলেন, আলালের ঘরের দুলালও চলিতভাষায় লেখা। এ কথা ঠিক নয়, কারণ এই বইএ প্রচুর গ্রাম্য আর ফারসী শব্দ থাকলেও

সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের সাধুরূপই দেখা যায়। রেনল্ড্স-এর গল্প অবলম্বনে লিখিত হরিদাসের গুপ্তকথা নামক একটি বই পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে খুব চলত। এই বই চলিতভাষায় লেখা কিন্তু তাতে সাধুর মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমযুগের গল্পের নরনারী সাধুভাষায় কথা বলত। তার পর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখক তাঁদের পাত্র-পাত্রীদের মুখে চলিতভাষা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁরা নিজের বক্তব্য সাধুভাষাতেই লিখতেন। আরও পরে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্য রচনা চলিত ভাষাতেই লিখতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তাই এখন চলিতভাষার প্রামাণিক বা স্ট্যাণ্ডার্ড রীতি রূপে গণ্য হয়।

আজকাল বাংলায় যা কিছু লেখা হয় তার বোধ হয় অর্ধেক চলিতভাষায়। সাধুভাষা এখন প্রধানত খবরের কাগজে, সরকারী বিজ্ঞাপনে, দলিলে আর স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়। অধিকাংশ গল্প এখন চলিত ভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু সকলে এ ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি, তার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। সাধুভাষা এখনও টিকে আছে, তার কারণ চলিতভাষায় যথেচ্ছাচার দেখে বহু লেখক তা পরিহার করে চলেন। ‘বল্ল, দিলো, কোর্ছে’ প্রভৃতি অদ্ভুত বানান এবং ‘কারুরকে, তাদেরকে, ঘরের থেকে’ প্রভৃতি গ্রাম্য প্রয়োগ বর্জন না করলে চলিতভাষা সাধুর সমান দৃঢ়তা ও স্থিরতা পাবে না। লেখকদের মনে রাখা আবশ্যক যে চলিতভাষা কলকাতা বা অন্য্ কোনও অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নয়, সাহিত্যের প্রয়োজনে উদ্ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional ভাষা। এই ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দিষ্ট ধাতুরূপ ও শব্দরূপ মানতে হবে এবং সাধুভাষার সঙ্গে বিস্তর রফা করতে হবে।

বানানের অসাম্য

বাংলা বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বিস্তর অভিযোগ পত্রিকাদিতে ছাপা হয়েছে। সকলেই বলেন, নিয়মবন্ধন দরকার। ঠিক কথা, কিন্তু কে নিয়মবন্ধন করলে লেখকরা তা মেনে নেবেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্বভারতী? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ? প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র সেই নিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করে তাঁদের সম্মতি জানিয়েছিলেন। তার পর থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী মোটামুটি সেই বানানে ছাপা হচ্ছে, অনেক লেখকও তার কিছু কিছু অনুসরণ করে থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ লেখক এই নিয়মগুলির কোনও খবরই রাখেন না, রাখলেও তাঁরা চিরকালের অভ্যাস বদলাতে চান না। আসল কথা, নিয়ম রচনা যিনিই করুন, সকলের তা পছন্দ হবে না, লেখকরা নিজের মতেই চলবেন। বাঙালীর নিয়মনিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিক নেতা বা ধর্মগুরুর আজ্ঞা বাঙালী ভাবের আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না।

বাংলা বানানে সামঞ্জস্য শীঘ্র দেখা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। অ্যা, য়্যা, এ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বানান চলতে থাকবে, যাঁরা নূতনত্ব চান তাঁরা 'বংগ, আকাংখা, উচিৎ, কোরিলো, বিশেষতো' লিখবেন এবং দেদার ও-কার আর হস্-চিহ্ন অনর্থক যোগ করবেন। হিন্দীভাষী সোজাসুজি বানান করে লখনউ, কিন্তু বাঙালী তাতে তুষ্ট নয়, লেখে লক্ষ্ণৌ। অকারণ য-ফলা দিয়ে লেখে স্যার, অকারণ ও-কার দিয়ে লেখে পে᳚ াল। নিয়মবন্ধনে ফল হবে না। যত রকম বানান এখন চলছে তার কতকগুলি কালক্রমে বহুসম্মত ও প্রামাণিক গণ্য হয়ে স্থায়িত্ব পাবে, বাকীগুলি লোপ পাবে।

পূর্ববঙ্গের প্রভাব

সেকালে যখন সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ে বোঝা যেত না তাঁরা কোন্ জেলার লোক। কলকাতার রমেশচন্দ্র দত্ত, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চাটগাঁয়ের নবীনচন্দ্র সেন, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। তাঁদের রচনায় গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ না থাকায় ভাষার ভেদ হ'ত না। কিন্তু আজকাল চলিতভাষায় যা লেখা হয় তা পড়লে প্রায় বোঝা যায় লেখক পূর্ববঙ্গীয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয়। 'আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা, কেমন জানি (কেমন যেন), সুন্দর মতে' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু এসব প্রয়োগ অশুদ্ধ নয়, অতএব বর্জনীয় বলা যায় না। পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত -গুলি আর -টা প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে -রা যোগ করেন। ('আকাশ হতে জলেরা ঝরে পড়ছে'), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক -কে বিভক্তি লাগান ('বইগুলিকে গুছিয়ে রাখ')। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সওয়া' (১$\frac{১}{৪}$) স্থানে 'দেয়া নেয়া সোয়া' লেখেন,, মোমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন। এই সব প্রয়োগও নিষিদ্ধ করা যাবে না। বিলাত আর মার্কিন দেশের ভাষা ইংরেজী, কিন্তু অনেক নামজাদা লেখকের রচনায় ওয়েল্স স্কচ বা আইরিশ ভাষার ছাপ দেখা যায়, মার্কিন ইংরেজী অনেক সময় খাস ইংরেজের অবোধ্য ঠেকে। পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপত্তি করা চলবে না।

তথাপি মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার সঙ্গেই সাহিত্যিক চলিতভাষার সাদৃশ্য বেশী। সকল লেখকই তাঁদের প্রাদেশিক সংস্কার পরিহার করে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা

করেন। এতে কোনও জেলার গৌরব বা হীনতার প্রশ্ন ওঠে না, বিশেষত দৈববিপাকে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন সমস্ত বাঙালী হিন্দুর আশ্রয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেক সময় অজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর (এবং পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি জেলাবাসীর) লেখায় অপ্রামাণিক বানান এসে পড়ে, যেমন অস্থানে চন্দ্রবিন্দু বা যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব, ড় আর র-এর বিপর্যয়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তাঁর এক বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন—ঘাঁড়ে ফোঁড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। যোগেশচন্দ্র উত্তরে লেখেন—আপনার ঘাড় আর ফোড়ায় চন্দ্রবিন্দু দেখিয়া আমি আরও কষ্ট পাইলাম। অনেকে 'চেইন, ট্রেইন, মেরেইজ (marriage)' লেখেন। এঁদের একজনের কাছে শুনেছি, 'চেন' লিখলে 'চ্যান' পড়বার আশঙ্কা আছে, তার প্রতিষেধের জন্য ই দেওয়া দরকার। আরও কয়েকজন যুক্তি দিয়েছেন, খাস ইংরেজের উচ্চারণে ই-ধ্বনি আছে। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার বানানে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, অতএব কাছাকাছি বানানেই কাজ চালাতে হবে। 'চেইন' লিখলে সাধারণ পাঠকের মুখে ই-কার অত্যধিক প্রকট হয়ে পড়ে, সেজন্য 'চেন' লেখাই উচিত। লেখকের মুখের ভাষায় প্রাদেশিক টান থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু লেখবার সময় সকলেরই সতর্ক হয়ে প্রামাণিক বানান অনুসরণ করা উচিত।

শব্দ ও অর্থের শুদ্ধি

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের তুলনায় এখনকার লেখকরা বেশী ভুল করেন, যাঁরা বাংলায় এম. এ. পাস করেছেন তাঁরাও বাদ যান না। সেকালে লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্য লেখকদের নিয়ন্ত্রিত

করতেন। একালে লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে। অশুদ্ধির একটি প্রধান কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা পূর্বের তুলনায় খুব কমে গেছে।

অনেকে বলে থাকেন, ভাষা ব্যাকরণের অধীন নয়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নিয়ম চালাবার দরকার নেই। এ কথা সত্য যে জীবিত ভাষা কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণের শাসন পুরোপুরি মানে না, স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে, সেজন্য কালে কালে তার ব্যাকরণ বদলাতে হয়। শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দাবলী শব্দার্থ আর বাক্যরচনার রীতিও বদলায়। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যে সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা চলে না। ল্যাটিন গ্রীক যে অর্থে মৃতভাষা সংস্কৃত সে অর্থে মৃত নয়। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরও শব্দ নেওয়া হয় এবং ব্যাকরণের বিধি অনুসারে নূতন শব্দ তৈরি করা হয়। শুধু বাংলা ভাষা নয়, আসামী ওড়িয়া হিন্দী মারাঠী গুজরাটী ভাষাও সংস্কৃত থেকে শব্দ নেয়। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার এবং শব্দরচনার চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে বাংলা ভাষার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী, শব্দের বানান আর অর্থ বিকৃত করলে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হবে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা দুর্বোধ হবে।

সজ্ঞানে শব্দের অপপ্রয়োগ করতে কেউ চায় না, কিন্তু মহামহা-পণ্ডিতেরও ভুল হতে পারে। প্রখ্যাতনামা নমস্য লেখকের ভুল হলে খাতির করে বলা হয় আর্যপ্রয়োগ, কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রামাণিক বলে গণ্য হয় না। ভুল জানতে পারলে অনেকে তা শুধরে নেন, কিন্তু যাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তিনি ছাড়তে চান না। ভুল প্রয়োগের সমর্থনে অনেক সময় কুযুক্তি শোনা যায়। বাংলায় 'চলন্ত' আর

'পাহারা' আছে, কিন্তু অনেকে তাতে তুষ্ট নন, সংস্কৃত মনে করে 'চলমান' আর 'প্রহরা' লেখেন। যখন শোনেন যে সংস্কৃত নয় তখন বলেন, বাংলা স্বাধীন ভাষা, সংস্কৃতের দাসী নয়; চলমান আর প্রহরা শ্রুতিমধুর, অতএব চলবে। 'কার্যকরী' স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু বোধ হয় সুমিষ্ট, তাই 'কার্যকরী উপায়, কার্যকরী প্রস্তাব' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়।

'কর্মসূত্রে' স্থানে 'কর্মব্যপদেশে', 'ধূমজাল' স্থানে 'ধূম্রজাল', 'শয়িত বা শয়ান' স্থানে 'শায়িত', 'প্রসার' স্থানে 'প্রসারতা', কৌশল বা পদ্ধতি অর্থে 'আঙ্গিক', প্রামাণিক অর্থে 'প্রামাণ্য', ক্ষীণ বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক রচনায় প্রচুর দেখা যায়। এই সব শব্দের বদলে শুদ্ধ শব্দ লিখলে রচনার মিষ্টত্বের লেশমাত্র হানি হয় না। ভাষার শুদ্ধিরক্ষার জন্য সতর্কতা আবশ্যক—এ কথা শুনলে নিরঙ্কুশ লেখকরা খুশী হন না। তাঁদের মনোভাব বোধ হয় এই।—যা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আর পাঁচ-জনেও যা লিখছে তা অশুদ্ধ হলেও মেনে নিতে হবে। আমি যদি গলা-ধাক্কা অর্থে গলাধঃকরণ লিখে ফেলি এবং আমার দেখাদেখি অন্যেও তা লিখতে আরম্ভ করে তবে সেই নূতন অর্থই মানতে হবে।

ইংরেজীর প্রভাব

ইংরেজী অতি সমৃদ্ধ ভাষা। মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য সাবধানে ইংরেজী থেকে শব্দ আর ভাব আহরণ করলে কোনও অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যা আমাদের আছে তাকে অবহেলা করে যদি বিদেশী শব্দ বা বাক্যের নকল চালানো হয়, তবে অনর্থক দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং মাতৃভাষা বিকৃত হবে। medium-এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম'-এর প্রয়োজন আছে, যথাস্থানে তার প্রয়োগ সার্থক। কিন্তু

ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে লেখা হয়—'বাংলা ভাষার মাধ্যমে 'বিজ্ঞানশিক্ষা।' 'বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা' লিখলে হানি কি ? সম্প্রতি দেখেছি—'এই সভায় অনেক ব্যক্তিতার সমাগম হয়েছিল।' ইংরেজী personality-এর আক্ষরিক অনুবাদ না করে 'বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম' লিখলে কি চলত না ? promise আর signature-এর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'-এর অপপ্রয়োগ আজকাল খুব দেখা যায়।—'নারীমাত্রেই মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।' 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।' একজনের লেখায় দেখেছি—'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থাৎ took no notice)। এই রকম অন্ধ অনুকরণ যদি চলতে থাকে তবে বাংলা ভাষা শীঘ্রই একটা উৎকট সংকর ভাষায় পরিণত হবে।

উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর

নীরদ চৌধুরীর বহু বিতর্কিত ইংরেজী বইএ এই রকম একটা কথা আছে—বাঙালী বিনা আড়ম্বরে কিছু লিখতে পারে না। যুদ্ধ বেধেছে, এই সোজা কথার বদলে লিখবে—রুদ্র তাঁর প্রলয়নাচন নাচতে আরম্ভ করেছেন। চৌধুরী মহাশয় কিছু অত্যুক্তি করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বাংলা কাগজে আগুন লাগা বা অগ্নিকাণ্ডর খবর লেখা হয়—বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা। জলে ডুবি বা জলমজ্জনকে বলা হয় সলিল-সমাধি। 'ব্যর্থ হইল' লিখলে যথেষ্ট হয় না, লেখা হয়—'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।' বাংলাভাষী স্থানে লেখা হয় 'বাংলাভাষাভাষী।' সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে অনেকে পারেন না।

বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা অনর্থকর। বক্তব্য সহজে বোঝা যাবে মনে করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক

ভাষা প্রয়োগ করেন।—‘কোষ্ঠকাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কাজ করে।’ ‘যে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলো কণার থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে।’ যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার করে স্পষ্টতা আর শৃঙ্খলিত যুক্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে। যাঁরা স্কুল কলেজের জন্য বিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের সেরকম চেষ্টা না করাই ভাল।

১৩৬০

জাতিচরিত্র

ভাইকাউণ্ট স্যামুএল একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিক। এককালে সার হারবার্ট স্যামুএল নামে ইনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তিরাশি বৎসরে পদার্পণ করে ইনি পার্লামেণ্টে হাউস অভ লর্ডসে নিজ দেশের নৈতিক অবস্থা (The State of Britain's Morals) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। তার ভাবার্থ এই—

ব্রিটেনের রাজনীতিক আর্থনীতিক আন্তর্জাতিক প্রভৃতি নানা সমস্যা আছে, কিন্তু সব চেয়ে চিন্তার বিষয়—আমাদের জাতীয় চরিত্র। যাঁরা এ সম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁদের অনেকে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় আছে। আমাদের নির্বাচক মণ্ডলে যে তিন কোটি ভোটদাতা আছে তাদের বুদ্ধি ও কর্তব্যনিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে ছাড়া কমে নি। কিন্তু দেশবাসীর এক অংশের যে চারিত্রিক অবনতি দেখা যাচ্ছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের বড় বড় শহরে যেসব দুষ্ক্রিয়ার আড্ডা আছে তা ব্রিটিশ সভ্যতার কলঙ্ক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কিছু কাল এদেশে অপরাধীর সংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে অর্ধেক জেলখানা বন্ধ রাখলেও চলত। কিন্তু এখন তার উলটো হয়েছে, বিশেষত অল্প-বয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। খবরের কাগজে প্রতিদিন যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয় তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। পূর্বের তুলনায় লাম্পট্য খুব বেড়ে গেছে, ব্যভিচার তুচ্ছ পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিবাহভঙ্গ এখন একটা নিত্যনৈমিত্তিক সামান্য ঘটনা বলে গণ্য হয়। আরও ভয়ানক

কথা—the vices of Sodom and Gomorrah appear to be rife among us। বাইবেলে আছে, ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। এখন তা হবার নয়, কিন্তু বর্তমান সমাজে এই পাপের পরিণাম আরও মারাত্মক ভাবে দেখা দেবে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি বিষাক্রান্ত হবে। অনেকে মনে করেন এসব কথা সাধারণের আলোচ্য নয়। কিন্তু ধর্মনীতি যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সমগ্র জাতিকে তার ফলভোগ করতে হবে। স্বর্গ নরক সম্বন্ধে জনসাধারণের পূর্বে যে ধারণা ছিল তা এখন নেই, দুই মহাযুদ্ধের ফলে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেও লোকের আর আস্থা নেই। শারীরবিদ্যা আর মনোবিদ্যার নূতন নূতন মতবাদের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ কমে গেছে। এখন শোনা যায়, প্রত্যেক মানুষের আচরণ তার জন্মগত gene সমূহের (আদিম জন্মকোষের কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম উপাদানের) ফল, অতএব বেশী দোষ ধরা ঠিক নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ত্রুটি উদার ভাবে বিচার করাই উচিত।

পরিশেষে স্যামুএল বলেছেন, আমাদের সদাচার বা কদাচারের মূলে আছে ব্যক্তিগত আদিম জন্মকোষের বৈশিষ্ট্য—এইটেই সব কথা নয়। যে সামাজিক পরিবেশে আমরা জন্মগ্রহণ করি তার রীতিনীতি এবং লোকমত অনুসারেই আমাদের চরিত্র প্রধানত গঠিত হয়। সকল দেশের মানবসমাজের বহু যুগের চিন্তার ফলে যা উদ্ভূত হয়েছে সেই সর্বজনীন ধর্মনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর—এই সহজ বুদ্ধি আমাদের ফিরে আসা আবশ্যক।

ফরাসী আর মার্কিন জাতির দোষও অনেক পত্রিকায় আলোচিত হয়। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা স্থায়ী হয় না তার কারণ ফরাসী জাতি অব্যবস্থিতচিত্ত। শাসকবর্গের অসাধুতা লাম্পট্য আর অকর্মণ্যতার

জন্যই গত যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল। সম্প্রতি Ernest Raynaud নামক একজন ফরাসী সম্পাদক New York Times পত্রিকায় লিখেছেন—সুরাসক্তিতে ফরাসী জাতি অদ্বিতীয়, মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো মিলে প্রতি বৎসরে যা উদরস্থ করে তাতে খাঁটী অ্যালকোহলের পরিমাণ দাঁড়ায় জন পিছু গড়ে সাত গ্যালন (প্রায় ৮৪ বোতল ব্রাণ্ডি বা হুইস্কির সমান)। ফ্রান্সের একপঞ্চমাংশ লোক মদ তৈরি বা বিক্রি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দেশব্যাপী সুরাপ্লাবন রোধ করবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপরিষদে শৌণ্ডিকরাই সর্বেসর্বা, তাদের অমতে কিছু করা সরকারের অসাধ্য। খবরের কাগজ নীরব, কারণ অপ্রিয় সত্য লিখলেই বিজ্ঞাপনের আয় বন্ধ হবে। সম্প্রতি একজন মন্ত্রী মদ্যপতিদের দমন করতে গিয়ে পদচ্যুত হয়েছেন।

কয়েক মাস পূর্বে Times Literary Supplement-এ আমেরিকার নাগরিক জীবনের কঠোর সমালোচনা ছাপা হয়েছে। জুয়া জুলুম আর ধনবাহুল্য—এই হচ্ছে মার্কিন সভ্যতার অঙ্গ। ধনীরা আত্মরক্ষার জন্য গ্যাংস্টার বা গুণ্ডাদের টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা রাখে। রাষ্ট্রচালনার সকল ক্ষেত্রে ঘুষ চলে, সেনেটার জজ মেয়র শেরিফ সেনাপতি কেউ বাদ যান না। ধনী অপরাধীরা অনায়াসে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে।...ইত্যাদি।

বড় বড় পাশ্চাত্ত্য জাতির দোষের ফর্দ শুনে আমাদের উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। আমরা শান্ত শিষ্ট সোনার চাঁদ, নৃশংসতা ব্যভিচার লাম্পট্য সুরাসক্তি আমাদের মধ্যে কম, অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল—এমন মনে করা ঘোর মূর্খতা। বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের জন্য জওহরলাল আছেন, বিধান রায় আছেন, তাঁদের শায়েস্তা রাখবার জন্য কমিউনিস্ট প্রজা-সোশালিস্ট প্রভৃতি দল আছে, দুর্মুখ খবরের

কাগজ আছে, অতএব আমরা রাম-শ্যাম-যদুর দল নিশ্চিন্ত হয়ে যা পারি রোজগার করব আর অবসর কালে সিনেমা ফুটবল নাচ গান গল্প উপন্যাস সর্বজনীন পূজো প্রভৃতি সংস্কৃতিচর্চায় মেতে থাকব—এই মনোবৃত্তি অনর্থকর। যে স্বাধীনতা আমরা সাত শ বছর পরে অতি কষ্টে পেয়েছি তা বজায় রাখতে পারব কিনা, ব্রিটিশ ভারতের চাইতে সমৃদ্ধতর ভারত গড়তে পারব কিনা—এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া যায় না। আমরা, অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ যদি নিজের অসংখ্য ত্রুটি শোধনের চেষ্টা না করি এবং প্রজার কর্তব্যে অবহেলা করি তবে কোনও রাষ্ট্রনেতা বা রাজনীতিক দল আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।

ভারতবাসী মোটের উপর শান্তিপ্রিয় অহিংস। এ দেশেও নেশাখোর, জুয়াড়ী, সাধারণ আর অসাধারণ লম্পট আছে, চোর ডাকাত খুনে ঘুষখোর আছে, যুদ্ধের পর তাদের উপদ্রব বেড়েও গেছে, কিন্তু জনসংখ্যায় এইসব অপরাধীর অনুপাত বেশী নয়। ব্যভিচার খুব কম, ভবিষ্যতে হয়তো কিছু বাড়বে, কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তা সইতে হবে। কয়েকটি বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতির তুলনায় ভাল, কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ে অতি মন্দ। সমগ্র ভারতের অবস্থা আলোচনা না করে শুধু বাংলা দেশের (পশ্চিম বাংলার) কথাই ধরা যাক।

স্যামুএল বলেছেন, ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় আছে। দেশরক্ষার জন্য অপরিহার্য এই দুই গুণ আমাদের কতটা আছে? অনেক বাঙালী ছেলে মেয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে তা সত্য, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এদেশের বিপ্লবীরা বহু বৎসরে ব্রিটিশ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সে পদ্ধতিতে আক্রামক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না। বর্তমান সরকারকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে

পুলিসের সঙ্গে লড়াই, ট্রাম-বাস পোড়ানো, বোমা ছোড়া, দোকান লুঠ, ইত্যাদি কর্মের জন্য বীরপুরুষ ঢের আছে তা ঠিক। কিন্তু আজ যদি কোনও বক্তিয়ার খিলজি সতরো বা সাত হাজার সৈন্য নিয়ে দেশ আক্রমণ করে তবে ক জন বাঙালী তাদের বাধা দেবে? যাদের প্ররোচনায় আমাদের ছেলেরা 'চলবে না চলবে না, মানতে হবে মানতে হবে' বলে গর্জন করে, সেই অন্তরালস্থ নেতারা তখন কি করবে? শত্রুর দলে যোগ দেবে না তো? তখন কি শুধুই গোর্খা-শিখ-গাড়োআলী পল্টন আমাদের হয়ে লড়বে আর আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দুর্গানাম জপ করব?

হুজুগে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুণ্ডামি করা আর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়, শিক্ষাও আবশ্যক। দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি দলে দলে বাঙালীর ছেলে সাগ্রহে যোগ দেয় তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত, এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে—এ কথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

দেশের উপর একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল ছড়িয়ে আছে, প্রজা বা শাসক কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভয় করেন, পরীক্ষার সময় যারা নকল করে তাদের বাধা দিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করতে সাহস করেন না, পাছে সে আত্মহত্যা করে অথবা তার সঙ্গীরা সদলে এসে প্রতিশোধ নেয়। ব্রিটিশ আমলে পুলিস বেপরোয়া ছিল, তার এই ভরসা ছিল যে প্রবলপ্রতাপ মনিব পিছনে আছেন। কিন্তু এখন পুলিস দ্বিধায় পড়েছে, কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বলপ্রয়োগ চলবে তা তার বর্তমান মনিবরা স্থির করতে পারেন না। চোর ডাকাত প্রভৃতি

মামুলী অপরাধীদের বেলায় ঝঞ্ঝাট নেই, কিন্তু আজকাল যেসব নূতন নূতন বেআইনী ব্যাপার হচ্ছে তার বেলায় নির্ভয়ে কর্তব্য পালন অসম্ভব। অফিস ও কারখানার কর্মীরা মনিবদের আটকে রাখে, ধর্মঘটীরা রাজপথে লোকের যাতায়াতে বাধা দেয়, স্কুল কলেজ বা অফিস প্রভৃতি কর্মস্থান অবরোধ করে, গুণ্ডারা ট্রাম-বাস পোড়ায়। এসব ক্ষেত্রে পুলিস উভয় সংকটে পড়ে। নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে অকর্মণ্য বলা হবে, কর্তব্য পালন করলে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলা হবে। অধিকাংশ খবরের কাগজ অপক্ষপাতে কিছু লিখতে সাহস করে না, পাছে কোনও দল চটে। তারা দুই দিক বজার রাখার চেষ্টা করে, ফলে পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়। দশ-বারো বছরের ছেলে যখন বলে, নেমে যান মশাইরা, এ গাড়ি পোড়ানো হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুর মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং অন্যায় কর্মে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝঞ্ঝাটে দরকার কি বাপু —এই হচ্ছে জনসাধারণের নীতি। পাশ্চাত্ত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনায় এই ক্লীবতা আর কর্তব্যবিমুখতা অনেক বড় অপরাধ।

শাসকবর্গ যদি ঘোর অত্যাচারী হয় এবং প্রতিকারের অন্য উপায় না থাকে তবে রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কোনও দলের অসন্তোষের কারণ ঘটলেই যদি সেই দল উপদ্রব করে তবে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং তার ফলে জনসাধারণ সংকটে পড়ে। লোকে শান্তি চায়, অধিকাংশ লোকের এ বুদ্ধিও আছে যে দুষ্ট-দমনের জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক এবং মাঝে মাঝে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার ফলে নির্দোষেরও অপঘাত হতে পারে, যেমন যুদ্ধকালে অনেক অযোদ্ধাও মারা যায়। আমাদের শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণও তা বোঝেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে ভয়

পান। বোধ হয় ভবিষ্যৎ নির্বাচনের কথা ভেবেই তাঁরা মতি স্থির করতে পারেন না। জনসাধারণের যদি ধারণা হয় যে কংগ্রেসী সরকার অত্যাচারী তবে তাঁদের ভোট দেবে কে? যে ছোকরার দল আজ হইহই করে উপদ্রব করছে, নির্বাচনের সময় তাদেরই তো সাহায্য নিতে হবে, তারাই তো 'ভোট ফর অমুক' বলে চেঁচাবে। অতএব তাদের চটানো ঠিক নয়। খবরের কাগজকেও উপেক্ষা করা চলবে না, তারা জনসাধারণকে খেপিয়ে দিতে পারে। শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি নিজ দলের লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে নির্ভয়ে কর্তব্যপালন করেন তবেই বর্তমান অবস্থার প্রতিকার হবে। জনকতক নেতা না হয় নির্বাচনে পরাস্ত হবেন, কিন্তু জনসাধারণ যদি সুশাসনের ফল উপলব্ধি করে তবে ভবিষ্যতে তারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে ভুল করবে না।

যেমন অন্য দেশে তেমনি এদেশেও অধিকাংশ লোকের কোনও নির্দিষ্ট রাজনীতিক মত নেই। রাস্তার পোস্টার, প্রচারকদের বুলি, আর দলীয় খবরের কাগজের দ্বারাই তারা সাময়িক ভাবে প্রভাবিত হয়। বাঁধাধরা রাজনীতিক মত না থাকলে কোনও ক্ষতি হয় না, রাজনীতির চাইতে ঢের বেশী দরকার প্রজার যথার্থ স্বার্থবুদ্ধি এবং বিভিন্ন দলের উক্তি-প্রত্যুক্তি বিচার করবার ক্ষমতা। যে কিষান-মজদুর-রাজের কথা অনেক নেতা বলে থাকেন তার মানে কি? কিষান-মজদুর সেক্রেটারিয়েটে বসে রাজ্য চালাবে, না জনকতক নেতা তাদের প্রতিনিধি সেজে কর্তৃত্ব করবেন? সাম্যবাদের জয় হলেও তো দেশে মূর্খ অকর্মণ্য ধূর্ত আর স্বার্থপর লোক থাকবে, রাজ্যচালনের ভার কারা নেবে তা স্থির করবে কে? বিদেশী গুরুর আজ্ঞাবহ শিষ্যরা? কমিউনিস্টরা ব্রিটেন-আমেরিকার বিস্তর দোষ ধরে, কিন্তু রাশিয়ার তিলমাত্র দোষের কথা বলে না কেন? কংগ্রেসের পন্থা

কি ? বার বার গান্ধীজীর নাম নিলে আর মাঝে মাঝে খাদি পরলেই কি কংগ্রেসী হওয়া যায় ?

সাত বৎসর আগেও কংগ্রেসের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, জনসাধারণ কিছু বুঝুক না বুঝুক কংগ্রেসের বশে চলত। কিন্তু এখন অন্তত পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কমে গেছে, লোকে মনে করে কংগ্রেসী সরকার রাজস্বের অপব্যয় করেন, স্বজন পোষণ করেন, ধনপতিদের বশে চলেন। এই ধারণার উচ্ছেদ না হলে কংগ্রেসী সরকারের শীঘ্রই পতন হবে।

প্রবাদ আছে—প্রজা যেমন, তার ভাগ্যে শাসনও তেমনি জোটে। আমাদের জনসাধারণের কর্তব্যজ্ঞান না বাড়লে শাসনের উৎকর্ষ হবে না। দেশে শিক্ষিত জনের সংখ্যা যতই অল্প হ'ক, তাঁরাই উদ্‌যোগী হয়ে জনসাধারণকে সুবুদ্ধি দিতে পারেন, যাতে তারা প্রজার অধিকার আর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় উদাসীন, তাঁদের অধিকাংশ নিজের ধান্দা বা শখ নিয়ে ব্যস্ত। যারা অল্পবয়স্ক তারা নিত্য নব নব বর্বরতায় মেতে আছে—বাগ্‌দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, হোলির উন্মত্ত হুল্লোড়, যে-কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে লাউড স্পীকারের অপপ্রয়োগ আর পটকার আওয়াজ। এদের সুরুচি আর সংযম শেখাবার গরজ কারও নেই।

আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের মতন নেশাখোর নই, কিন্তু একটা প্রবল মানসিক মাদক এদেশের জনসাধারণকে অভিভূত করে রেখেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তার কবল থেকে মুক্ত নয়। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমাদের ধর্মের অর্থ প্রধানত বাহ্য অনুষ্ঠান, নানা রকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, এবং ভক্তির চর্চা। অর্থাৎ পুরোহিত মারফত পূজা, কবচ-মাদুলি, আর যদি ভক্তি থাকে তবে ইষ্টদেবের আরাধনা। পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্মচর্চা এই রকম। কিন্তু যদি

সাধারণ জীবনযাত্রাও অন্ধ সংস্কারের বশে চলে তবে জাতির অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

নানা বিষয়ে এদেশের লোকের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। নেপালবাবার দৈব ঔষধের লোভে অসংখ্য লোকের কষ্টভোগ আর কুম্ভস্নানপুণ্যের দুর্বার আকর্ষণে বহু লোকের প্রাণহানি এই মোহের ফল। ফলিত জ্যোতিষ একটি প্রাচীন সংস্কার, যেমন মারণ উচ্চাটন বশীকরণ। কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবুও লোক মনে করে এ একটা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা। ভাগ্যগণনা কত ক্ষেত্রে সফল হয় আর কত ক্ষেত্রে বিফল হয় কেউ তা বিচার করে না। অনেক খবরের কাগজে প্রতি সপ্তাহে জ্যোতিষিক ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রকাশ করে সাধারণের অন্ধবিশ্বাসে ইন্ধন যোগানো হয়। আমাদের যেটুকু পুরুষকার আছে দৈবের উপর নির্ভর করে তাও বিনষ্ট হচ্ছে।

মহাভারতে কৃষ্ণ ধর্মের এই অর্থ বলেছেন—ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ—ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এজন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধি-সমূহই ধর্ম। প্রজার যা সর্বাঙ্গীণ হিত তাই সমাজের হিত। প্রজা বলবান বিদ্যাবান বুদ্ধিমান নীতিমান বিনয়ী (disciplined) হবে, আত্মরক্ষায় ও দেশরক্ষায় প্রস্তুত থাকবে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করবে, সর্বপ্রকারে জনহিত চেষ্টা করবে—এই হল ধর্ম, এতেই লোকের কর্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। অধিকন্তু যে লোক ঈশ্বরপরায়ণ হয়, অর্থাৎ বিশ্ববিধানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে, মানুষের স্বাভাবিক ভাববৃত্তি বা emotion তৃপ্ত করতে পারে, তার ধর্মাচরণ সর্বতোভাবে সার্থক হয়। যিনি কর্মবিমুখ হয়ে শুধু ভক্তিরসে ডুবে থাকেন তিনি ধর্মাত্মা বা মুক্তপুরুষ হলেও একদেশদর্শী, তাঁর ধর্মসাধনা পূর্ণাঙ্গ নয়, সাধারণের পক্ষে আদর্শস্বরূপও নয়। যিনি

শুধু দেহচর্চা বা বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকেন তিনিও ধর্মের অংশমাত্র চর্চা করেন। বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সকলের জন্য নয়, প্রত্যেকে নিজের রুচি আর প্রবৃত্তি অনুসারেই ধর্মাচরণ করতে পারে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ করে ধন্য হতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ যদি কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করে এবং ধর্মের অন্যান্য অঙ্গ উপেক্ষা করে কেবল ভক্তির চর্চা করে, তবে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে 'অনুশীলন' প্রসঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর পরেও বহু মনীষী অনুরূপ উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক যুগে বোধ হয় বিবেকানন্দই একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি সর্ব ভারতে কালোপযোগী বলিষ্ঠ ধর্মের প্রচার করেছেন। এদেশে সম্প্রতি বহু ধর্মোপদেষ্টা সাধুর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের ভক্তও অসংখ্য। তাঁরা প্রধানত ভক্তিতত্ত্ব এবং ভগবানের লীলাই প্রচার করেন। বহু ভক্ত তাঁদের কথায় শোকে শান্তি পায়, দয়া ক্ষমা অলোভ প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রেরণা পায়। কিন্তু তাঁদের ধর্মব্যাখ্যান এমন নয় যাতে আমাদের জাতিচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে। ভক্তগণের মতে তাঁদের কেউ কেউ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অনুগত জনের আর্থিক উন্নতি করতে পারেন, রোগ সারাতে পারেন, মকদ্দমা জেতাতে পারেন, নানা রকম ভেল্‌কি দেখাতেও পারেন। কয়েক জনের শিষ্যরা প্রচার করে থাকেন যে তাঁদের ইষ্টগুরু ভগবানের অবতার বা পূর্ণ ভগবান। গুরু তা অস্বীকার করেন না, blasphemyর জন্য শিষ্যকে ধমকও দেন না। আমাদের অন্য অভাব যতই থাকুক অবতারের অভাব নেই। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশ—এই হল অবতারের আসল কাজ। তার দিকে এঁরা একটু দৃষ্টি দেন না কেন?

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত—এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। যে ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের হিতকর এবং জাতিচরিত্রের উন্নতিসাধক, সেই সর্বসম্মত সর্বাঙ্গীণ ধর্মই আমাদের লোকায়ত (secular) রাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষকরাই এই ভার নেবেন, ছাত্রের বাল্যকাল থেকেই তাকে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আর রাষ্ট্রিক কর্তব্য শেখাবেন। এখন যারা অল্পবয়স্ক, ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্রগঠনের ব্যবস্থায় বিলম্ব করা চলবে না। যখন শ্রমিকের দল ধর্মঘট করে তখন উপস্থিত সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে রফা করেন, অনিচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই অর্থের হয়তো আরও সৎপ্রয়োগ হতে পারত। কিন্তু শিক্ষকদের কর্মের ফল সদ্য দেখা যায় না, সে কারণে সরকার বোঝেন না যে রাষ্ট্রের অন্যান্য বহু শাখাকে বঞ্চিত করেও শিক্ষককে তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে তাঁর অভাব না থাকে এবং শিক্ষার কার্যে তিনি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

১৩৬০

সমদৃষ্টি

ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করছি, বাবা প্রশ্ন করলেন, কি বই পড়ছ?

উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

—কোন্‌খানটা?

—মোগল সম্রাটদের বংশ। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, তাঁর পুত্র আকবর, তার পর জাহানগির শাজাহান আরংজিব—

—হয়েছে হয়েছে। নিজের পিতামহর নাম জান?

শুনেছিলাম আমার ঠাকুদ্দা নেপোলিয়ন আর রণজিৎ সিংহের আমলের লোক, কিন্তু তাঁর নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না। বললাম, ভুলে গেছি।

—লিখে নাও। তোমার পিতামহ কালিদাস বসু, প্রপিতামহ গুরুদাস, বৃদ্ধ প্রপিতামহ রত্নেশ্বর, অতিবৃদ্ধ রামসন্তোষ, অতি-অতিবৃদ্ধ রামভদ্র।

গড়গড় করে উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নাম করে বাবা বললেন, মুখস্থ করবে, ভুলে যেয়ো না যেন। এঁরা মোগল বাদশাদের চাইতে তোমার ঢের বেশী আপন জন।

আপন জন হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে নগণ্য পেটি বুর্জোআ। একটু আধটু ভাল মন্দ কাজ করে থাকবেন, কিন্তু এঁদের ভাগ্যে স্থকীর্তি বা কুকীর্তি কিছুই লাভ হয় নি। এঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ বা দিগ্‌বিজয় করেন নি, ধর্মসংস্থাপন বা রাজ্যশাসন করেন নি, তাজমহল গড়েন নি, বাপকে কয়েদ আর ভাইদের খুন করেন নি। এই পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল না, শুধু বাবার আজ্ঞায় নাম মুখস্থ করতে হল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। বাবার

বংশপ্রীতি অসাধারণ ছিল, ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত বংশবিবরণ ছাপিয়েছিলেন। সেই চটি বই একখানা আমাকে দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে পড়বে, হিস্টরির চাইতে কম দরকারী নয়।

বড় হয়ে শুনলাম, সাত পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড, তার পর আরও সাত পুরুষ পর্যন্ত সমানোদক। অর্থাৎ পরলোকস্থ ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের অন্তর্গত সকলকে মাঝে মাঝে পিণ্ড দিতে হয়, আরও সাত পুরুষকে শুধু জল দিয়ে তর্পণ করলেই চলে। আরও আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কিছু না দিলেও দোষ হয় না।

যাঁদের চোখে দেখেছি, স্নেহ পেয়েছি, এবং তাঁদের মুখে যাঁদের বিবরণ শুনেছি তাঁরাই আমার সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমার জ্ঞাত শ্রদ্ধাভাজন আপন জন, সেজন্য সপিণ্ড। পূর্বে যে সাত পুরুষ ছিলেন তাঁদের নাম ছাড়া হয়তো কিছুই জানা নেই, তাঁরা আমার সমানোদক। তাঁদের ঊর্ধ্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুধুই জ্ঞাতি। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে এইভাবে আত্মবর্গের বিভাগ করা হয়েছে। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই থেকে মানুষের উৎপত্তি, কিন্তু অধিকাংশ সমাজে মানুষ পিতৃকুলে বাস করে, সেজন্য বংশগণনায় পিতৃকুলই ধরা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পুংসম্পর্ক বাদ দিয়েও কোনও কোনও স্ত্রীপ্রাণীর গর্ভাধান করতে পেরেছেন। হয়তো ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষেও মাতাই মুখ্য এবং পিতা গৌণ ও ক্ষেত্র-বিশেষে অনাবশ্যক গণ্য হবেন।

উৎপত্তিকালে আমরা পিতা মাতা থেকে যেসব দৈহিক উপাদান পাই তার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ক্রোমোসোম, জীন, বা যাই হক, চলিত কথায় তাকেই রক্তের সম্পর্ক বলা হয়। পিতা মাতা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা রক্ত-সম্পর্কের অর্ধেক অংশ পাই। সিকি অংশ

পিতামহ-মহী মাতামহ-মহী প্রত্যেকের কাছ থেকে পাই। ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ থেকে ১/৬৪ অংশ এবং চতুর্দশ পুরুষ থেকে ১/৮১৯২ অংশ পাই। একবিংশতিতম পুরুষ থেকে যা পাই তা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ডাইলিউশনের মতন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর সূত্রে আমাদের বংশধারা বজায় থাকে এবং তাতেই আত্মীয়তাবোধ তৃপ্ত হয়।

যোগসূত্র যেমনই হক, সম্পর্ক যত নিকট, আত্মীয়তাবোধ ততই বেশী। কিন্তু স্থলবিশেষে এই বোধ আরও প্রসারিত হয়। বিলাতের অভিজাতবর্গ উইলিয়ম-দি-কংকরার, রবার্ট ব্রুস ইত্যাদি থেকে বংশ গণনা করতে পারলে অত্যন্ত গৌরব বোধ করেন। আমাদের দেশেও অদ্বৈত মহাপ্রভু, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতির বংশধর নিজকে ধন্য মনে করেন। গল্প আছে, কোনও এক বড়লাটের মুখে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ শুনে একজন রাজপুত নৃপতি বলেছিলেন, আমার বংশমর্যাদা আপনার চাইতে ঢের বেশী; আমি সূর্যবংশজাত আর আপনি বানরের বংশধর।

সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আত্মীয়রাই সব চেয়ে আপন জন। তার পর যথাক্রমে সগোত্র, সবর্ণ, স্বজাতি, স্বদেশবাসী বা সধর্মী। সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা, চর্চা বা হুজুগের ফলেও আত্মীয়তাবোধের তারতম্য হয়। গোঁড়া বাঙালী ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে বাঙালী শূদ্রের তুলনায় অবাঙালী ব্রাহ্মণ বেশী আত্মীয়। এ দেশের অনেক মুসলমান মনে করে ভারতীয় হিন্দুর চাইতে ইরানী আরবী তুর্কী মুসলমানদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশী। রাজনীতিক কারণে বা প্রাদেশিক বিরোধের ফলে এইপ্রকার ধারণার পবিবর্তন হতে পারে।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর আর্যতার মোহ ছিল। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশ খাঁটী আর্য অর্থাৎ ইংরেজ জার্মনের স্বজাতি ছিলেন, এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশের রোদ বৃষ্টিতে আধুনিক বাঙালীর চেহারা বদলে গেছে। আর্যতা বজায় রাখবার জন্য এবং উচ্চতর বর্ণে প্রমোশন পাবার জন্য অনেকের উৎকট আগ্রহ ছিল। অব্রাহ্মণরা পইতে নিয়ে ধন্য হতেন, কেউ কেউ অগ্নিহোত্রীও হতেন। আমরা শুনতাম, ব্রহ্মার কায় থেকে কায়স্থ, হাড় থেকে হাড়ী, বাক্ থেকে বাগদী, চামড়া থেকে চামার হয়েছে। এখনও অনেকে কৌলিক পদবীতে তুষ্ট নন, নামের শেষে শর্মা বর্মা জুড়ে দিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

ইতিহাস আর নৃবিদ্যার গবেষণার ফলে আমাদের আর্যতার অভিমান দূর হয়েছে, আমরা এখন বুঝেছি যে বাঙালী (এবং অধিকাংশ ভারতীয়) অতিমিশ্র সংকর জাতি, সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য নানা নৃজাতির রক্ত ও সংস্কৃতি আমাদের দেহে মনে ও সংস্কারে বিদ্যমান আছে। আমাদের সকলের সাংকর্য এবং বংশগত (inherited) দেহলক্ষণ সমান নয়, সেজন্য আকৃতির বিলক্ষণ প্রভেদ দেখা যায়। 'কালো বামুন, কটা শূদ্র,' নর্ডিক, মঙ্গোলীয়, সাঁওতালী, হাবশী, সব রকম চেহারাই আমাদের ইতর ভদ্রের মধ্যে অল্পাধিক আছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা নিজেকে ইওরোপীয় জানতে পেরে প্রথমে স্তম্ভিত তার পর নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আমরাও সেই রকম আবিষ্কারের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলছি, যাক বাঁচা গেল, কর্তার ভূত আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছেন, এখন আমরা আত্মপরিচয় মোটামুটি জেনেছি। দ্রাবিড়, কিরাত (মঙ্গোলয়েড), নিষাদ (অস্ট্রিক), আল্পীয় প্রভৃতি নানা জাতির রক্ত

আমাদের দেহে আছে, নর্ডিক রক্তেরও ছিটোফোঁটা আছে। যাঁরা সবিশেষ জানতে চান তাঁরা কেন্দ্রীয় নৃবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের 'ভারতীয় জাতি পরিচয়' পুস্তিকা পড়ে দেখবেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আমাদের কুলগর্ব খর্ব হয়েছে কিন্তু এই আশ্বাসও পেয়েছি যে, উৎপত্তি যেমনই হক, কৃতিত্বের সম্ভাবনা সব জাতিরই সমান, শুধু জন্মের ফলে কেউ herren volk হয় না। কর্ণের মতন আমরা সকলেই বলতে পারি—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।

এচ. জি. ওয়েল্স তাঁর First and Last Things গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—যত পিছনে যাওয়া যায় ততই আমাদের পূর্বপুরুষ (ও তৎস্ত্রী)-দের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমার পিতা মাতা দুজন, পিতামহ-মহী মাতামহ-মহী চারজন, প্রপিতামহ প্রভৃতি আটজন। এই রকম দ্বিগুণোত্তর হিসাব করলে দেখা যাবে—পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২০০ কোটির চাইতে আমার শততম পূর্বস্ত্রীপুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশী। এই হিসাবে অতিগণনা আছে, কারণ পূর্বজ-গণের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বিস্তর হয়েছিল। তথাপি বলা যেতে পারে—যাঁরা আমার শততম পূর্বজ, এবং তাঁদের মধ্যে যাঁদের বংশধর এখনও জীবিত আছে, তাঁরা শুধু আমার নয়, বর্তমান সমস্ত মানবের পূর্বজনকজননী। ওয়েল্সের এই সিদ্ধান্তে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবজাতির মধ্যে যে বংশগত সম্বন্ধ এবং রক্তের যোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত লোকই আমার জ্ঞাতি, সপিণ্ড বা সমানোদক না হলেও সমপ্রভব বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমান মানবজাতির নাম দিয়েছেন হোমো সাপিয়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞমানব। এই জাতির বয়স অনেকের মতে লক্ষ বৎসরের

কাছাকাছি। আমাদের চতুঃসহস্রতম পূর্বপুরুষরা হয়তো অবিজ্ঞ অবমানব ছিলেন, সাধারণ লোকে যাকে মিসিং লিংক বলে। আরও পিছিয়ে গেলে বনমানুষ বানর এবং নিম্নতর অসংখ্য প্রকার জীব দেখা দেবে। শাস্ত্রে ব্রহ্মা থেকে জীবোৎপত্তি ধরা হয়েছে, সে হিসাবে আব্রহ্মস্তম্ব মায় ব্যাকটিরিয়া পর্যন্ত আমার জ্ঞাতি। বহু কোটি বৎসর পূর্বে যে সমুদ্রজলে আদিম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তাতে লবণের পরিমাণ এখানকার চেয়ে কম ছিল। সেই অল্পলবণাক্ত কারণবারি আজ পর্যন্ত প্রাণিদেহের রক্তরসে বা প্লাজমায় বিদ্যমান থেকে সর্বপ্রাণীর বংশগত সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

মানুষ এবং ইতর প্রাণীর যে সন্তানস্নেহ ও স্বজাতিপ্রীতি দেখা যায় তা স্বভাবজাত, বংশপর্যায় গণনা না করেই উদ্ভূত হয়েছে। আদিম মানুষের পরপ্রীতি বা পরার্থপরতা বেশী ছিল না, সমাজের অভিব্যক্তির ফলে ক্রমে ক্রমে স্বজনপ্রীতি, মানবপ্রীতি আর ইতরজীবপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক সভ্য মানুষ যুদ্ধ করে, মৃগয়া খেলা বিলাস খাদ্য ও অন্য নানা উদ্দেশ্যে প্রাণিহত্যা করে। তথাপি এই ধারণা ধীরে ধীরে উদ্ভূত হচ্ছে—সর্বমানবপ্রীতি ও সর্বজীবপ্রীতিই আদর্শ ধর্ম।

আদর্শ আর আচরণ সমান হয় না সেইজন্যই বলা হয়েছে—জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা মনে করেন খ্রীষ্টের দশ অনুশাসনই শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি, কিন্তু কার্যত তাঁরা অনেক অনুশাসন মানেন না। গোঁড়া হিন্দু মুখে বলেন গোমাতা, কিন্তু গোখাদক পাশ্চাত্ত্য জাতির তুল্য গোসেবা এদেশে দেখা যায় না। আদর্শ আর আচরণের প্রভেদ সব সমাজেই আছে, তথাপি বলা যায়, আদর্শ যত উন্নত ততই আচরণের উৎকর্ষের সম্ভাবনা আছে।

আত্মীয়তাবোধের যখন চরম প্রসার হয় তখন সর্বভূতে সমদৃষ্টি

আসে। এই সাম্যের উপলব্ধি ভারতীয় জ্ঞানী ও সাধকদের মধ্যে যেমন হয়েছে অন্য দেশে তেমন হয় নি। অভিব্যক্তিবাদ আর সর্বজীবের বংশগত সম্বন্ধ না জেনেও এদেশের আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষরা বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীতা)

—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে পণ্ডিতরা সমভাবে দেখেন।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ (মনু)

—যে সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের ভিতর সর্বভূতকে দেখতে পায় সেই আত্মযাজী স্বারাজ্য লাভ করে।

যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম॥ (মহাভারত)

—যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য (অবলম্বনীয়)।

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥ (ভাগবত)

—আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্মনিবৃত্তিও চাই না, দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের আর্তিনাশই চাই।

যেন কেন প্রকারেণ যস্য কস্যাপি জন্তুনঃ।
সন্তোষং জনয়েদ্‌ধীমান্ তদেবেশ্বরপূজনম্॥ (ভাগবত)

—যিনি ধীমান তিনি যে কোনও প্রকারে যে কোনও জন্তুর সন্তোষ উৎপাদন করবেন, তাই ঈশ্বরপূজা।

এদেশে সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও অহিংসার বাণী বহু ভাবে বহু মুখে প্রচারিত হয়েছে, তার ফলে ভারতবাসীর (বিশেষত হিন্দু জৈন প্রভৃতির) চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য এসেছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায়

আমরা অপেক্ষাকৃত অহিংস্র মৃদুস্বভাব ও পরমতসহিষ্ণু। প্রাচীন মিশরীয়গণ যেমন কয়েকটি প্রাণীকে দেবতুল্য গণ্য করত, হিন্দুও গরুকে সেইরকম মর্যাদা দেয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে অকর্মণ্য ও মরণাপন্ন পালিত জন্তুকে মেরে ফেলা হয়, এদেশে সে প্রথা নেই। হিন্দুর মৃগয়াপ্রবৃত্তিও কম। এখনকার তুলনায় প্রাচীন ভারতে আমিষাহার বেশী প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের প্রভাবে তা কমে গেছে। মহাভারতে মনুর উক্তি আছে—যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে মন্ত্রপূত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবিঃস্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য মাংস বৃথামাংস এবং অভক্ষ্য। সম্রাট অশোক প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে যত নিরামিষাশী আছে অন্য দেশে তত নেই, তবে স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে যে পাশ্চাত্ত্য বিলাসিতার স্রোত এসেছে তার ফলে নিরামিষাশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমিষাহার প্রচলিত হচ্ছে।

উক্ত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বলা চলে না যে অন্যদেশবাসীর তুলনায় ভারতবাসী অধিকতর সমদর্শী। এদেশে অস্পৃশ্যতা আছে, উচ্চ বর্ণের অভিমান এবং নীচ বর্ণের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা আছে। যার ধর্ম ভাষা আকৃতি পরিচ্ছদ খাদ্য ইত্যাদি ভিন্নপ্রকার তাকে আমরা আপন জন মনে করতে পারি না। ইংরেজীতে একটি ব্যঙ্গোক্তি আছে— সব মানুষ সমান, কিন্তু কেউ কেউ বেশী সমান। আমাদের সমদর্শিতা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক সাধু অনেক ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু ভক্তি আর অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার যত হয়েছে জনহিতব্রত আর সমদর্শিতার প্রচার তেমন হয় নি। আশার কথা, ভারত সরকার এদিকে মন দিয়েছেন এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সকল সভ্য সমাজেই সমদর্শিতা আদর্শরূপে অল্পাধিক স্বীকৃতি পেয়েছে, আদর্শ আর আচরণের প্রভেদও সর্বত্র আছে। শ্বেত আর অশ্বেত জাতির মর্যাদা সমান নয় এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশে খুবই প্রবল। তথাপি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ধীরে ধীরে উদার হচ্ছে এবং ইতরপ্রাণীর প্রতিও যে মানুষের কর্তব্য আছে এই ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বহু বৎসর পূর্বে টমাস হেনরি হাক্সলি লিখেছিলেন—মানব-জাতির দুরকম নীতি বা আদর্শ আছে এবং এই দুইএর দ্বন্দ্ব চিরকাল চলছে। একটি হচ্ছে ধর্মনীতি বা সাধারণ মরালিটি, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অহিংসা দয়া সত্য অলোভ সমদর্শিতা পরোপকার প্রভৃতি এর অঙ্গ এবং প্রধান প্রধান সকল ধর্মেই এই সকল বৃত্তি প্রশংসিত হয়েছে। অপর নীতিটি অত্যন্ত প্রাচীন, জীবোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সহজাত সংস্কাররূপে উদ্ভূত হয়েছে। হাক্সলি এই নীতির বিশেষণ দিয়েছেন কস্‌মিক, অর্থাৎ নৈসর্গিক। এই নীতির লক্ষ্য স্বার্থসাধন এবং তার জন্য যে পরিমাণ পরপ্রীতি আবশ্যক শুধু তারই চর্চা। এই নিসর্গনীতি অনুসারে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইতর জীবের গোষ্ঠীবন্ধন এবং আদিম মানব সমাজের উদ্ভব হয়েছে। কৌটিল্য আর মেকিয়াভেলি এই নীতিই বিবৃত করেছেন এবং নেপোলিয়ন হিটলার মুসোলিনি প্রভৃতি তা অবলম্বন করে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রের ব্যবহারে যে কুটিলতা দেখা যায় তাও এই নীতির ফল।

ধর্মনীতি বলে—পরের অনিষ্ট ক'রো না। নিসর্গনীতি বলে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য করতে পার। শেষোক্ত নীতি অনুসারেই সেকালে এদেশের রাজারা দিগ্‌বিজয় করতেন। পরাক্রান্ত জাতি দুর্বলের উপর

এখনও আধিপত্য করে, প্রবল ব্যবসায়ী দুর্বল প্রতিযোগীর জীবিকা নষ্ট করে। রাজনীতিক উদ্দেশ্যে এবং পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য সংবাদপত্রাদির সাহায্যে অজস্র অসত্য প্রচার করা হয়। যুদ্ধকালে বিপক্ষের গ্রামনগরাদি ধ্বংস এবং নিরপরাধ অসংখ্য প্রজার সর্বনাশ করা হয়। সমাজ রক্ষার জন্য অপরাধী দণ্ড পায় কিন্তু তার পরিবারের যে দুর্দশা হয় তার প্রতিকার হয় না।

আদিম যুগ থেকে মানুষ নানা উদ্দেশ্যে প্রাণিপীড়ন করে আসছে। আত্মরক্ষার জন্য অনেক প্রাণী হত্যা করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আমিষাহারী। মাছ ধরা, পাখি হরিণ ইত্যাদি মারা অনেকের বিচারে নির্দোষ আমোদ। রেশম তসর গরদ ইত্যাদির জন্য অসংখ্য কীট হত্যায় আমাদের আপত্তি নেই, হিন্দুর বিচারে কৌষেয় বস্ত্র আর মৃগচর্ম অতি পবিত্র। বলদকে নপুংসক করে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে আমাদের বাধে না। মধুর লোভে আমরা মৌমাছির কষ্টসঞ্চিত ভাণ্ডার লুঠ করি, অনেক ক্ষেত্রে বুভুক্ষু বাছুরকে বঞ্চিত করে দুধ খাই। তুচ্ছ শখের জন্য আকাশচারী পাখিকে বন্দী করি। আধুনিক সভ্য সমাজে অনর্থক প্রাণিপীড়ন গর্হিত গণ্য হয়, কিন্তু আত্মরক্ষা, খাদ্য, মৃগয়া, বিলাস, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবহিংসায় দোষ ধরা হয় না।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্ণ অহিংসা এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, হাক্সলি-কথিত নিসর্গনীতি বর্জন করে উচ্চতম ধর্মনীতি অনুসারে জীবনযাপন করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তা অসম্ভব। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরভাব এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা শীঘ্র দূর হবে না, জনসাধারণের পক্ষেও নিঃস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় ধর্মনীতি আর নিসর্গনীতির মধ্যে রফা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আধুনিক হিউম্যানিজ্‌ম বা মানবধর্মে

এই রফার চেষ্টা আছে। এই ধর্মে জ্ঞান ও ভক্তির চর্চায় বাধা নেই, কিন্তু প্রধান লক্ষ্য—সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের অবিরোধে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থসাধন এবং সেই স্বার্থের অবিরোধে যথাসম্ভব জীবে দয়া। মহাভারতে হংসরূপী প্রজাপতি বলেছেন—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। চণ্ডীদাস বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য। এই দুই উক্তির গূঢ় অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে আধুনিক হিউম্যানিজমের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এই ধর্ম এখন পর্যন্ত একটি সমস্যাসংকুল অতি অস্পষ্ট আদর্শ মাত্র। এর নির্বচন বা enunciation হয় নি, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ও হয় নি। তথাপি আশা হয় এই ধর্মের ক্রমবিকাশের ফলে সাধারণ মানুষ যথাসম্ভব সমদর্শিতা লাভের উপায় আবিষ্কার করবে।

১৩৬১

অশ্রেণিক সমাজ

'ক্লাসলেস সোসাইটি' বা অশ্রেণিক সমাজের কথা এদেশের ও বিদেশের অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু তার লক্ষণ কেউ স্পষ্ট করে বলেছেন বলে মনে হয় না। শ্রেণী অনেক রকম আছে, ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য সমাজের শ্রেণীভেদ সমান নয়। সব রকম ভেদের লোপ অথবা কয়েক রকমের লোপ যাই কাম্য হ'ক, উপায় নির্ধারণের আগে বিভিন্ন ভেদের স্বরূপ বোঝা দরকার।

এমন আদিম জাতি থাকতে পারে যাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ মোটেই নেই অথবা খুব কম। সভ্য সমাজ যদি পুরোপুরি অশ্রেণিক হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা কল্পনা করা যেতে পারে। জীবনযাত্রার মান সকলের সমান হবে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারও যদি অধিক অর্থাগম হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হিতার্থে বাজেয়াপ্ত হবে। সকলেই সমান পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন হবে, বিবাহ ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে সুন্দর-কুৎসিত বা পণ্ডিত-মূর্খের ব্যবধান থাকবে না। সকলেই শিক্ষা, জীবিকা, বিবাহ আর চিকিৎসায় সমান সুযোগ পাবে। অবশ্য বিদ্যা বুদ্ধি আর বলের বৈষম্য থাকবেই, কিন্তু তার জন্য আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবে না। দুঃসাধ্য রোগ বা বার্ধক্যের ফলে যারা অকর্মণ্য তাদের রক্ষা বা অরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক লোক যদি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয় বা নির্যাতন ভোগ করে তবে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমভোগী সংঘ গঠন করে। রোমান সাম্রাজ্যে অত্যাচারিত খ্রীষ্টানদের সমাজ প্রায় অশ্রেণিক ছিল। নাৎসি-বিতাড়িত অনেক

ইহুদী-পরিবারও নির্বাসনে এসে শ্রেণীভেদ পরিহার করেছিল। কিন্তু অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেদবুদ্ধি আবার পূর্ববৎ হয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজে একই ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। অব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না। যাঁরা অল্প গোঁড়া তাঁরা বৈদ্যকায়স্থাদি ভদ্রশ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, কিন্তু পৃথক পঙ্‌ক্তিতে বসেন। যাঁরা আর একটু উদার তাঁরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ভোজে পঙ্‌ক্তিবিচার করেন কিন্তু অন্যত্র করেন না। যাঁরা আরও সংস্কারমুক্ত তাঁরা কোনও ক্ষেত্রেই করেন না। ভোজন ব্যাপারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, তবে এই ভেদ ক্রমশ কমে আসছে।

আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু স্বজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সর্বনিম্ন বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিচিত অব্রাহ্মণকে দেখলে আগেই নমস্কার করেন। কেউ কেউ এতই পতিত যে শূদ্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেও তাঁদের বাধে না। যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর তাঁরা নমস্কার পাবার পর প্রতিনমস্কার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিনমস্কার করেন না, বড়জোর একটু হাত বা মাথা নাড়েন। প্রথম শ্রেণীর বিপ্র অতি বদান্য, প্রণাম পেলেই পদধূলি দেবার জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

উচ্চবর্ণের বা আভিজাত্যের অভিমান অসংখ্য লোকের আছে। যাঁরা অতি সজ্জন, অপরকে ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায় যাঁদের কিছুমাত্র নেই, এমন লোকেরও আছে। এঁরা শাস্ত্রবিধি বা নিজ সমাজের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করতে চান না, মনে করেন তাতে পাপ বা জাতিপাত বা মর্যাদাহানি হয়। অনেকে নির্বিচারে কেবল সংস্কার বা অভ্যাসের বশেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। যাঁরা অল্পাধিক সংস্কারমুক্ত তাঁদের প্রত্যবায়ের ভয় না থাকলেও নিজ সমাজের ভয় আছে, সেজন্য অবস্থা বুঝে নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করেন। যাঁরা আরও উদার ও

সাহসী তাঁরা বর্ণানুসারে শ্রেণীবিচার করেন না, শুধু দেখেন পঙ্‌ক্তির লোকের বেশ ও আচরণ সভ্যজনোচিত কিনা। যাঁরা পূর্ণমাত্রায় সমদর্শী তাঁরা কিছুই বিচার করেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে ধর্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব সংস্কার-মুক্ত ছিলেন, বর্ণভেদের কঠোরতা মানতেন না। একথা যে মিথ্যা তা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন না। এঁরা উচ্চনীচ সকলের জন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ধর্মমতের সংকীর্ণতা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমাজব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেন নি। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুবর্তীরাই এদেশে সমাজসংস্কারের প্রবর্তক। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার বিবেকানন্দ আরম্ভ করে গেছেন। আজকাল প্রতিপত্তিশালী ধর্মোপদেষ্টা গুরুর অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা কেউ বিবেকানন্দর তুল্য সাহসী জনহিতব্রতী নন, সামাজিক দোষ শোধনের কোনও চেষ্টাই করেন না।

এককালে এদেশের ভদ্রশ্রেণীই উচ্চশিক্ষা আর ভদ্রোচিত জীবিকার সুযোগ পেত। দারিদ্র্যের জন্য এবং ক্ষমতাবান আত্মীয়বন্ধুর অভাবে ভদ্রেতর শ্রেণী এই সুযোগ পেত না। শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য এখন ক্রমশ কমে আসছে, কালক্রমে একবারে লোপ পাবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা আর প্রচারের ফলে জাতিগত বর্ণগত ও বংশগত ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা আর অমার্জিত আচরণের প্রতি

বিদ্বেষ ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। শুচিতার ধারণা সকলের সমান নয়। এদেশের লোক আহারের পর আচমন করে, মলত্যাগের পর জলশৌচ করে, অতি দরিদ্রও প্রত্যহ স্নান করে। এই সব বিষয়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য জাতি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। অনেক ইওরোপীয় নারী তার সন্তানের মুখ থুতু দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়, বিড়াল যেমন করে।

কয়েকটি বিষয়ে শুচিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতবাসীর কদভ্যাস অনেক আছে। যে অপরিচ্ছন্নতা দারিদ্র্যের ফল তা ধরছি না, কিন্তু যাঁরা অর্থবান ও ভদ্রশ্রেণীভুক্ত তাঁদেরও অনেক বিষয়ে শুচিতার অভাব দেখা যায়। বড় সওদাগরী আপিসে সাহেব আর দেশী কর্মচারীর জন্য আলাদা সিঁড়ি আছে। এখনকার দেশী সাহেবরাও বোধ হয় এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন। পার্থক্যের কারণ কি তা সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়। ভারতবাসীর বিচারে নিষ্ঠীবনের স্পর্শই ঘৃণ্য, দৃশ্য নয়, যত্র তত্র থুতু ফেলার অভ্যাস বহু লোকের আছে। দেশী সিঁড়ির স্থানে স্থানে আধার আছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল হয় না, আধার ছাপিয়ে দেওয়ালে পর্যন্ত পানের পিকের দাগ লাগে। সাহেবী সিঁড়ির এই বীভৎস কলঙ্ক নেই। যারা পরিচ্ছন্নতা চায় তাদের পৃথক সিঁড়ি আর পৃথক সমাজ না হলে চলে না।

ক্লাব বা আড্ডায় সমশ্রেণীর লোকেই স্থান পায়। বিলাতী ক্লাবে প্রবেশের নিয়ম খুব কড়া, যে-কেউ ইচ্ছা করলেই সদস্য হতে পারে না। বাঙালীর আড্ডায় সাধারণত নির্দিষ্ট কয়েক জনকেই দেখা যায় কিন্তু নূতন লোকও স্থান পায় যদি তার আচার-ব্যবহার বিসদৃশ না হয়। ক্লাব বা আড্ডার যে রীতি, দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহেরও তাই। যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সাধারণত নিজ শ্রেণীর জন্যই করেন, এই কারণে নিম্ন জাতি মন্দিরপ্রবেশে বাধা পায়। কালক্রমে যদি প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের স্বত্বের প্রমাণ লোপ পায় তবে সরকারী

আদেশে আপামর সকলেই প্রবেশাধিকার পেতে পারে। ভারতের অনেক বিখ্যাত মন্দিরে তাই হয়েছে। কিন্তু যত দিন সে ব্যবস্থা না হয় তত দিন শ্রেণীবিচার বজায় থাকে। চণ্ডীমণ্ডপ, ভাগবতসভা, ব্রাহ্মসমাজ বা গির্জায় যদি কোনও অপরিচ্ছন্ন বা কুৎসিতবেশ লোক আসতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও সে বাধা পায়।

জাতিবিচার বা অপরিচ্ছন্নতায় আপত্তি না থাকলেও নানা কারণে ভেদজ্ঞান আসে। আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি, বিত্ত, সমাজ, ধর্ম, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতির জন্যও শ্রেণীভেদ হয়। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই (যেমন মুসলমান ও ইওরোপীয় সমাজে) সেখানেও সৈয়দ ও মোমিন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, মলিনবেশ শ্রমজীবী আর white collar মসীজীবীর সমাজ পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক হোটেলে এশিয়া-আফ্রিকার লোক স্থান পায় না। কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইন করে এই পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লোকমতের পরিবর্তন হয় নি। চণ্ডাল যদি শিক্ষিত সজ্জন ধনী ও ভদ্রবেশী হয় তথাপি সে নিষ্ঠাবান উচ্চবর্ণ হিন্দুর বিচারে অপাঙ্‌ক্তেয়। এশিয়া-আফ্রিকার লোকের উপরেও পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুরূপ ঘৃণা আছে।

এদেশে ধনী ও বিলাসী সমাজ সমশ্রেণী ভিন্ন বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে চান না, পাছে শ্বশুরালয়ে মোটা চালচলনে কন্যার কষ্ট হয় বা বরের মর্যাদাহানি হয়। অল্পবিত্ত হিন্দু যৌথ পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ খুব কম দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দম্পতির নিজের আত্মীয়বর্গ থেকে পৃথক হয়ে বাস করবার সামর্থ্য আছে সেখানে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে।

ভারতের তুলনায় ইওরোপ-আমেরিকার ভদ্রসমাজে আচারগত ভেদ কম, তথাপি রাজনীতিক কারণে বিদ্বেষ দেখা যায়। ব্রিটিশ ও

জার্মন জাতির উৎপত্তি ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্য বেশী নয়, কিন্তু যুদ্ধ বাধলেই জার্মনরা হুন আখ্যা পায়। গত যুদ্ধে 'মিত্র'-পক্ষে থাকার সময় রাশিয়া জাতে উঠেছিল, কিন্তু এখন আবার অর্ধসভ্য এশিয়াটিক হয়ে গেছে, তাদের শায়েস্তা করবার জন্য বিজ্ঞানবলী জার্মন বীর জাতির প্রয়োজন হয়েছে।

লোকে কেবল যুক্তি আর ন্যায়বুদ্ধির বশে চলে না, বহুকাল থেকে বংশপরম্পরায় যে সংস্কার বদ্ধমূল হয় তা দূর করা সহজ নয়। কালক্রমে শিক্ষা আর প্রচারের ফলে অনেক বিষয়ে ভেদজ্ঞান কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রেণীলোপের সম্ভাবনা অত্যল্প। বর্তমান সমাজে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অনুমান করা যেতে পারে—

(১) বিদ্যা, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান নয়, কিন্তু জাতি বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে কোনও তারতম্য হয় না, প্রতিবেশ (environment) এবং শিক্ষার সুযোগ সমান হলে সকল শ্রেণীর লোকই তুল্য সামর্থ্য দেখাতে পারে। শ্রেণীবিশেষের সহজাত মানসিক উৎকর্ষ বা বংশগত আভিজাত্য থাকতে পারে না—এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কালক্রমে শিক্ষিত জন মেনে নেবে। যাদের দৃঢ়বদ্ধ অন্ধ সংস্কার আছে (যেমন হিটলারের সহকারিগণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ-বংশীয় আফ্রিকাণ্ডার জাতি, মার্কিন দেশের নিগ্রো-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং এদেশের অনেক উচ্চ বর্ণের লোক) তাদের ধারণার পরিবর্তন হতে বিলম্ব হবে।

(২) অনুকূল লোকমত এবং সরকারী চেষ্টার ফলে এ দেশে অস্পৃশ্যতা শীঘ্রই দূর হবে।

(৩) যৌথ পরিবার লোপের ফলে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ বহুপ্রচলিত হবে, ভিন্নপ্রদেশবাসীর মধ্যেও বিবাহ বৃদ্ধি পাবে।

(৪) আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি আর ধর্মের পার্থক্যের জন্য অপরের প্রতি যে বিরাগ দেখা যায় তা শিক্ষার বিস্তার এবং অধিকতর সংসর্গের ফলে ক্রমশ কমে যাবে।

(৫) যাদের বিদ্যা রুচি বৃত্তি বা রাজনীতি সমান তারা এখনকার মত ভবিষ্যতেও সংঘ ক্লাব বা ইউনিয়ন গঠন করবে কিন্তু এইপ্রকার দলবন্ধনের ফলে বর্ণভেদের তুল্য সামাজিক ভেদের উদ্ভব হবে না।

(৬) অনেক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র অনুসারে ধনী-দরিদ্রের ভেদ কমাবার চেষ্টা করছে। তার ফলে দারিদ্র্যজনিত হীনতা যথা অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ক্রমশ দূর হবে এবং সামাজিক বৈষম্য কমবে। কিন্তু ধনবৈষম্য একেবারে দূর হবে না, সোভিএট রাষ্ট্রেও হয় নি।

(৭) যে অপরিচ্ছন্নতা বহু দিনের কদভ্যাসের ফল তা দূর করার জন্য প্রবল প্রচার আবশ্যক, যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য হয়েছে। যাঁরা রাজনীতিক প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁরা জনসাধারণের কদভ্যাস নিবারণের জন্য কিছু সময় দিলে সমাজের মঙ্গল হবে। সংবাদপত্রেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

(৮) পূর্বের তুলনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে বিবাহ বেড়েছে, কিন্তু বহুপ্রচলিত হবার সম্ভাবনা কম। এইরূপ বিবাহের ফলে নূতন ইওরেশীয় সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে না, সন্তানরা পিতা বা মাতার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রূপবিচারের সময় লোকে সাধারণত সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কটা চোখ আর কটা চুল অধিকাংশ ভারতবাসীর পছন্দ নয়। এই প্রকার রুচিভেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ মোটের উপর বজায় থাকবে। তবে কাল-ক্রমে রুচির পরিবর্তন হতে পারে। শুনতে পাই, পাশ্চাত্ত্য সমাজে নিগ্রো জাজ-সংগীতের মত নিগ্রো দেহসৌষ্ঠবেরও সমঝদার বাড়ছে।

মোট কথা, অচির ভবিষ্যতে পূর্ণমাত্রায় অশ্রেণিক সমাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই আশা করা যেতে পারে—মানুষের ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণ উদাসীন সেখানে রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হবে, তার ফলেও শ্রেণীভেদ কমবে। মানবস্বভাবের যে বৃহৎ অংশ জন্মগত নয়, শিক্ষা চর্যা আর পরিবেশের ফল, সেই অংশের গঠনে সম্ভবত ভবিষ্যতে সকলেই সমান সুযোগ পাবে, তবে এই সামাজিক পরিবর্তন সকল রাষ্ট্রে সমান ভাবে ঘটবে না।

১৩৬১

নিসর্গচর্চা

কালিদাস যদি বাঙালী হতেন তবে বোধ হয় মেঘদূতের পূর্বমেঘ লিখতেন না কিংবা খুব সংক্ষেপে সারতেন, কিন্তু উত্তরমেঘ সবিস্তারে লিখতেন এবং তাতে বিস্তর 'মনস্তত্ত্ব' জুড়ে দিতেন। প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে বাঙালী অনেকটা উদাসীন, প্রাচীন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মতন নিসর্গপ্রীতি আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশী দেখা যায় না।

কলকাতা ইট কাঠ লোহা কংক্রীটের শহর, কর্জন পার্ক আর ইডেন গার্ডেন ধ্বংস করতে আমাদের কষ্ট হয় নি। কিন্তু জনসাধারণের উপেক্ষা সত্ত্বেও অনেক রাস্তার ধারে আর পার্কে এখনও গাছপালা আছে, তাতে বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র সমারোহ এখনও দেখা যায়। ইংরেজী স্টেট্সম্যান কাগজে মাঝে মাঝে তার বর্ণনা থাকে। বর্ষাকালে কলকাতার উপকণ্ঠে যে ভেক-সমাগম হয় আর অষ্টপ্রহরব্যাপী মকমক আলাপ শোনা যায় তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ কয়েক বৎসর আগে উক্ত পত্রে পড়েছিলাম।

দেশী সংবাদপত্রে এসব বিবরণ থাকে না। বাঙালীর মনে সাপ ব্যাং শেয়াল পোকামাকড় প্রভৃতির কথা রসের সঞ্চার করে না, অথচ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এই সব প্রাণী প্রচুর সমাদর পেয়েছে এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকরাও এদের উপেক্ষা করেন না। প্রতিদিন বিকালে আমাদের মাথার উপর দিয়ে আকাশপথে এক দিক থেকে আর এক দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়, আমরা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি না। বাড়ির কাছে গাছপালা থাকলে চৈত্র বৈশাখ মাসে কাক শালিক তাতে বাসা বাঁধে, বর্ষা আর শীতের শেষে নানারকম প্রজাপতি আসে, আমরা তাদের গ্রাহ্য করি না। সেদিন এক ইংরেজী

পত্রিকায় পড়েছি, এক শৌখিন ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির সামনে বাগান তৈরি করে একটি সাইন বোর্ড টাঙিয়েছিলেন—butterflies are welcome। বাঙালী এমন ছেলেমানুষী রসিকতা করে না।

অনেক বৎসর পূর্বে কোনও এক বাংলা সংবাদপত্রে একজন অনুযোগ করেছিলেন—দেশ এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন, কিন্তু আমাদের কবি আবৃত্তি করছেন—হৃদয় আমার নাচে রে, ময়ূরের মত নাচে রে! এই কি নাচবার সময়? কবি এর সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রের অনেক বিজ্ঞ পাঠক বলবেন, জগদ্ব্যাপী অশান্তির জন্য আমরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছি, এখন শুধু দেশের আর বিদেশের রাজনীতিক সংবাদ চাই, পুলিসের গুলিতে কজন মরল জানতে চাই, রেশনের চাল কবে বাড়ানো হবে তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি চাই; এই দুর্দিনে তুচ্ছ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও দেখতে পাই কুৎসিত মকদ্দমার বিবরণ লোকে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। সাপের দুই পা, ছাগলীর গর্ভে মর্কটের জন্ম, অমুক স্বামীজীর অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি যজ্ঞে এক শ মন ঘৃতাহুতি, অমুক অবতারের জন্মোৎসবে বত্রিশটা স্পেশাল ট্রেনে ভক্তসমাগম—এইসব খবরও অনেক পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে। কিন্তু কবে কোথায় অশথগাছ হঠাৎ তামা-রঙের ঝকঝকে পাতায় ছেয়ে গেল, গুলমোর সোঁদাল বা জারুলের ফুল ফুটল, কোথায় ব্যাং ডাকল, আকাশে বক না হাঁস কিসের ঝাঁক উড়ে গেল—এসব তুচ্ছ খবরে লেখক বা পাঠকের আগ্রহ হবে কেন? আমাদের অধিকাংশ গল্পলেখক মিস্টার বাসু মিসেস চ্যাটার্জি বা কলেজের ছেলেমেয়ের প্রেমলীলা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কেউ প্রাচীন বিপ্লবীদের জের এখনও টানছেন, কেউ কেউ নব বিপ্লবীদের আসরে নামাবার চেষ্টা করছেন। এঁদের ছ-সাত শ পাতার গল্পে টমাস হার্ডির মতন নিসর্গবর্ণনার স্থান হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। এ যুগের অনেক কবি, বিশেষত যাঁরা অত্যাধুনিক নন, এখনও নিসর্গচর্চা করেন। এমন গল্পকারও আছেন যাঁরা শুধু মানুষ-মানুষীর কথা লেখেন না, বৃক্ষ লতা ইতরপ্রাণী নদী প্রান্তর ইত্যাদিকেও গ্রন্থে সাদরে স্থান দিয়েছেন। তথাপি বলা যায়, ইংরেজ ও প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদের তুলনায় আধুনিক বাঙালী লেখক নিসর্গচর্চায় বিমুখ।

উপনিষদের ঋষি সমগ্র নিসর্গে ব্রহ্মোপলব্ধি করে বলেছেন—

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।

—তুমি নীল পতঙ্গ, হরিদ্‌বর্ণ লোহিতাক্ষ শুক তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, ঋতুসকল, সমুদ্রসকল।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অকৃত্রিম নিসর্গচিত্রণে বোধ হয় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ। বর্ষাবর্ণনায় তিনি লিখেছেন,

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি॥

—নানা আকারের নানা বর্ণের ভেক অবরুদ্ধ স্থানে দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিল, এখন তারা মেঘের শব্দে জাগরিত এবং নবজলধারায় সিক্ত হয়ে নানাপ্রকার রব করছে।

কীট্‌স তাঁর The Realm of Fancy কবিতায় লিখেছেন,

Thou shall see the field-mouse peep
Meagre from its celled sleep ;

And the snake all winter thin
Cast on sunny bank its skin.

কালিদাস বোধ হয় স্বচক্ষে তিমি দেখেছিলেন তাই রঘুবংশে লিখেছেন,

অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈ-
রূর্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্ ॥

—ওই তিমিকুল মস্তকের রন্ধ্র দিয়ে উপর দিকে জলপ্রবাহ ক্ষেপণ করছে।

কিপলিং নেকড়ে বাঘের গান লিখেছেন,

As the dawn was breaking the
Sambhur belled
Once, twice, and again!
And a doe leaped up, and a doe
leaped up
From the pond in the wood
where the wild deer sup.
This I, scouting alone, beheld
Once, twice, and again!

এইপ্রকার বর্ণনার অনুরক্ত পাঠক এককালে অনেক ছিল, কিন্তু এখন বড় একটা দেখা যায় না। লোকের রুচি কি বদলে গেছে? বোধ হয় যায় নি, অবহেলায় চাপা পড়ে আছে।

খাবারওয়ালাকে যদি প্রশ্ন করি—মিষ্টান্নে রং দাও কেন, বিকট বিলিতী গন্ধ দাও কেন, সে উত্তর দেয়, খদ্দের এইরকম রং আর গন্ধ চায় যে। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। তীব্র কৃত্রিম গন্ধযুক্ত সবুজ রঙের গ্রীন ম্যাংগো সন্দেশ পছন্দ করে এমন লোক হয়তো আছে। কিন্তু আসল কথা, খাবারওয়ালা নিজের রুচি আর বুদ্ধি অনুসারে

যে রং দেয়, গন্ধ দেয়, অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দেয়, ক্রেতা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, মনে করে এই হচ্ছে আধুনিক ফ্যাশন। খাদ্যের স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ স্বাদ অনেকেরই ভাল লাগে, কিন্তু মিষ্টান্নকার তা বোঝে না। অনেক গল্পকারও পাঠকসাধারণের স্বাভাবিক সুস্থ রুচির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করেন না। লোকে বিকৃত প্রেম আর লালসার চিত্র চায়, রোমাঞ্চ চায়, সেজন্য আমাদের কথাগ্রন্থে তাই থাকে—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গল্পকার নিজের রুচি অনুসারেই লেখেন এবং তিনি যদি শক্তিমান হন তবে পাঠকবর্গের মনেও তাঁর রুচি সঞ্চারিত হয়। পাঠক ফরমাশ করে না, লেখকের কাছ থেকে যা পায় তাই হাল ফ্যাশন বলে মেনে নেয়।

রাজনীতিক সামাজিক আর্থিক প্রভৃতি নানা সমস্যা আমাদের আছে। সাময়িক পত্রে এবং অন্যান্য সাহিত্যে তার বহু আলোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাঠকের মন শুধু সমস্যা আর তত্ত্বকথার আলোচনায় তৃপ্ত হয় না, নানাবিধ রসের কামনা করে। বাংলা সাহিত্য উন্নতির পথে চলেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ায় লোকের কর্মক্ষেত্র বেড়ে গেছে, গল্পের পাত্ররা এখন শুধু জমিদারপুত্র কেরানী লেখক চিত্রকর নয়, পাত্রীরা শুধু গৃহপালিতা অল্পশিক্ষিতা কন্যা বা কুলবধূ নয়। বাঙালী অনেক রকম বিজ্ঞান শিখছে, দেশবিদেশে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ নৈসর্গিক তথ্যের সন্ধানে অভিযানও করছে। কিন্তু এখনও আমাদের কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন প্রেম। পরিবর্তন এই হয়েছে—প্রেমের আর স্বাভাবিক রূপ নেই, 'আবেদন' বৃদ্ধির জন্য তাতে বিলিতী রং আর গন্ধ যোগ করা হয়। অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য গল্পও প্রেমমূলক, কিন্তু প্রেমবর্জিত গল্প আর গল্পতুল্য সুখপাঠ্য লঘু সাহিত্যও প্রচুর আছে এবং পাঠকরা তা আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে। বাংলা শিশুপাঠ্য গল্প আর বিলিতীর নকল ডিটেকটিভ কাহিনী অনেক

আছে, অল্প স্বল্প ভ্রমণকথাও আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের মতন বৈচিত্র্য এখনও দেখা যায় না।

শুধু কৌতূহলনিবৃত্তি বা উত্তেজনার জন্য লোকে খবরের কাগজ আর কথাগ্রন্থ পড়ে না, শান্তরসও অসংখ্য পাঠকের প্রিয়। শান্তরস অর্থে শুধু নামে রুচি বা ভক্তিরস নয়। বিস্তর বাঙালী স্ত্রীপুরুষ আজকাল এই রসে ডুবে আছে, তার বৃদ্ধির জন্য সাহিত্যিকদের চেষ্টা অনাবশ্যক। নামে রুচি ছাড়া জীবে দয়াও চর্চার যোগ্য। কিন্তু জীব শুধু দয়ার ভিখারী নয়, প্রীতি বিস্ময় আর কৌতূহলেরও পাত্র।

মানুষ জীবজগতের অংশ, উদ্‌ভিদ-প্রাণীর সঙ্গে তার আদিম আত্মীয় সম্পর্ক। আমাদের স্বজাতির মধ্যে শত্রুমিত্র আছে, উদ্‌ভিদ-প্রাণীর মধ্যেও মানুষের উপকারী অপকারী আছে, কিন্তু তার জন্য সমগ্র জীবজগতের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার হানি হয় নি।

অরণ্য জনপদ নগর যেখানেই বাস করুক, আবালবৃদ্ধবনিতা সুস্থচিত্ত মানুষ মাত্রেরই সহজাত নিসর্গপ্রীতি আছে। নাগরিক জীবনযাত্রায় তা অবদমিত হতে পারে কিন্তু লুপ্ত হয় না। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে আমাদের এই চিরন্তন সম্বন্ধ এবং প্রতিবেশী বৃক্ষ লতা গুল্ম পশুপক্ষী পতঙ্গাদির প্রতি স্নেহ বিস্ময় আর কৌতূহলের ভাব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনাবিল শান্তরসের উপাদান যুগিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য লেখক আর পাঠকরাও এই রসের পরম ভক্ত। কালিদাসের শকুন্তলা আর মেঘদূত প্রধানত নিসর্গচিত্রের জন্যই ইওরোপীয় পাঠকের মনোহরণ করেছে। আধুনিক বাঙালী লেখকরা যদি শান্তরসের এই হৃদ্য চিরন্তন উপাদান উপেক্ষা করেন তবে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বঞ্চিত হবে।

১৩৬১

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

অনেক বৎসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রূকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ-এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিএট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণু-বোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এঁদের যুক্তি এই রকম।

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিন-গন, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরীন,

বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা-শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে। মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃ-প্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জ্বলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক—বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন —সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি ইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্টদের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে

লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হ'ত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার—বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে—মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত হন, এঁরা নিষ্কাম শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক

দল নিজেদের বা পরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এঁরা সকাম ফলিত-বিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্বই নিষ্কাম বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছেয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠছে—এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অন্য লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আপাতত নেই। সেগুন আর ঘেঁটু একই বর্গের গাছ, চামচিকার দেহে রাডারের মতন যন্ত্র আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে—ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুম্বক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয়—এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞানমাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে মাংস সুস্বাদ হয়—এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্তু জনকতক কুতূহলী আছেন যাঁরা কার্য আর কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তার পর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন—আঁচ যতই বাড়ানো হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক পাচক পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না, জানলে ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কাণ্ডজ্ঞান (common sense), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান —এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম

সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান ইত্যাদির দ্বারা লব্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমন কি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জবিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধবিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সান স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টরপিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্ভাবকগণ ফললাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাছে বিজ্ঞান মুখ্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ—এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই তা ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক

প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে কেউ বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুণ্ডার জন্য ছোরা তৈরী হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরী স্থগিত থাকুক।

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক—এই আবদার করা বৃথা। হবুচন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণু-বোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে—টি-এন-টি আর ফসফরস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেরই দোষ।

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন—কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ—শস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় ন, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল

আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরা ঘোষণা করছেন যে পরমাণু-বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণু-বোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাসপ্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ. জি. ওয়েল্‌স, ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

এক কালে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল—সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। আজকাল শোনা যায়—মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই মানবজীবন সার্থক হবে। এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগসুখের বৃদ্ধি। ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে

—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, তারই পরিণামস্বরূপ অন্য দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি।

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। সকলের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাহুল্য আর বিলাসসামগ্রীর বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীতে বহু বার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার জন্যও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপকভাবে যে সব লোকহিতকর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদি দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ না হয়, তবে জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে।* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

* 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন' প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা আছে।

অবলম্বনের ফলে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির খাদ্য ও অন্যান্য জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ ছিল—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি বিষয়ের সাধনা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হ'ত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পঞ্চম পুরুষার্থ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের অবহেলার ফলে ভারতবাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সযত্নে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক—কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেণ্টলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অসতর্ক বিন্যাস। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে, অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণু-বংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটঘ্নের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে এমন মশক-বংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহুদূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হবে এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। মোট কথা, বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।

১৩৬২

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

কালচার শব্দের প্রতিশব্দ কেউ লেখেন কৃষ্টি কেউ লেখেন সংস্কৃতি। কালচার আর কৃষ্টি দুই শব্দেরই ব্যুৎপত্তিতে কৃষি বা কর্ষণের ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দ পছন্দ করতেন না, তিনিই সংস্কৃতি চালিয়েছেন।

কোনও ইংরেজী শব্দের যখন বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় তখন ইংরেজী শব্দের পারিভাষিক অর্থ পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়। Oxford Pocket Dictionaryতে culture-এর বিশিষ্ট অর্থ—

Trained and refined state of the understanding and manners and tastes ; phase of this prevalent at a time or place.

এই পারিভাষিক অর্থে বুদ্ধি আচরণ ও রুচির যে শিক্ষিত ও মার্জিত অবস্থা বোঝায় তা সংস্কৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নিহিত আছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে—'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল।' এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

> আমি সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এই শব্দত্রয় ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। (১) দেহের সুখ বিধান যে কৃতির লক্ষ্য তাহা সভ্যতা। (২) যদ্দ্বারা মনের সুখ সাধন হয় তাহা সংস্কৃতি। (৩) যদ্দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কৃষ্টি। মহেন-জো-দেড়োর আবিষ্কৃত পুরাকৃতি প্রাচীন সিন্ধুবাসীর সভ্যতার, ভরতনাট্যম্ প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির, এবং নয়টি অঙ্ক দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা প্রকাশ বৈদিক আর্যগণের কৃষ্টির পরিচয়।

ইংরেজী অভিধানে কালচার শব্দের যে বিশিষ্ট অর্থ দেওয়া আছে যোগেশচন্দ্র তাই বিশ্লিষ্ট করে সভ্যতা সংস্কৃতি আর কৃষ্টি এই তিন শব্দে ভাগ করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই বিশ্লেষণের ফলে কালচার-বিষয়ক আলোচনা সহজ হবে। পার্থক্য সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি বলা যেতে পারে—

(১) ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধান, দেওয়ানী ফৌজদারী আইন, জল-সেক ব্যবস্থা, বাঁধ, সেতু, লোহা প্রভৃতির কারখানা, বিবিধ প্রাসাদ, রেলগাড়ি মোটর-কার টেলিফোন রেডিও, বিদ্যুৎশক্তির বিস্তার, স্কুল কলেজ হাসপাতাল, দেশীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার পরিচায়ক, যদিও বহু ক্ষেত্রে কৃতি বা উদ্‌ভাবনের গৌরব বিদেশীর। চা সিগারেট কেক বিস্কুট, ইওরোপীয় প্যাণ্ট শার্ট কোট, 'পঞ্জাবী' জামা, গান্ধী টুপি, বিলাতী গড়নের জুতা, মাদ্রাজী চপ্পল—এ সবও আমাদের বর্তমান সভ্যতার অঙ্গ।

(২) প্রাচীন ও আধুনিক দেবমন্দির স্তূপাদি, ভারতীয় সংগীত চিত্র ও মূর্তিনির্মাণ কলা, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি ভারতের সংস্কৃতির পরিচায়ক। বাঙালীর বিশিষ্ট সংস্কৃতির উদাহরণ—কীর্তন ও বাউলের গান, রবীন্দ্র-সংগীত, প্রাচীন পট ও আধুনিক চিত্র-পদ্ধতি, এবং বাংলা সাহিত্য।

(৩) ভারতীয় কৃষ্টির পরিচায়ক—সংস্কৃত বর্ণমালা (alphabet), ব্যাকরণ ছন্দঃ ও অলংকার শাস্ত্র, বিবিধ দর্শন শাস্ত্র, এবং নবায়ত্ত বিজ্ঞান। বাঙালীর বিশিষ্ট কৃষ্টির উদাহরণ—নব্যন্যায়, দায়ভাগ, শুভংকরের গণনা-পদ্ধতি এবং বিধবা ও অসবর্ণের বিবাহের প্রবর্তনচেষ্টা। অনাবশ্যক বোধে টিকি-বর্জন—এও বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টির লক্ষণ।

সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালে কালে পরিবর্তিত হয়। দেড় শ

বৎসর আগে পর্যন্ত বাংলা দেশে এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়েছিল, তার পর ব্রিটিশ রাজত্বকালে অতি দ্রুত লয়ে ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তনের গতি আরও ত্বরিত হয়েছে।

কালচারের সর্বার্থক প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দই আজকাল বেশী চলছে, কিন্তু সাহিত্যিক আলোচনায় সংস্কৃতি যে অর্থে চলে তা যোগেশচন্দ্রের সংজ্ঞার্থেরই অনুরূপ। বাঙালীর সংস্কৃতি বললে যা বোঝায় তার প্রধান অঙ্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এখন তার কথাই বলছি।

প্রায় পাঁচ শ বৎসর এদেশে মুসলমান রাজত্ব ছিল, তার ফলে হিন্দু সংস্কৃতিতে মুসলমান (বা পারসীক) প্রভাব কিছু কিছু এসে পড়েছে। বিস্তর ফারসী আরবী আর তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্গত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের কাল দু শ বৎসরেরও কম, কিন্তু সংস্কৃতিতে তার প্রভাব আরও ব্যাপক। এর কারণ, ব্রিটিশ শাসনের উপর যতই বিদ্বেষ থাকুক, ব্রিটিশ সংস্কৃতি আর সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তার ফলে আধুনিক বাংলা ভাষা ইংরেজীর অনুবর্তী হয়ে পড়েছে, শিক্ষিত বাঙালীর সমাজও ক্রমে ক্রমে ইওরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করছে।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে তার প্রভাব বাংলা ভাষার উপর অবশ্যই কিছু পড়বে, কিন্তু ইংরেজীর তুল্য নয়, কারণ হিন্দীর সে প্রতিপত্তি নেই। ইংরেজীর স্থান হিন্দী কখনও নিতে পারবে না। অন্ধ হিন্দীপ্রেমী ছাড়া সকলেই বুঝেছেন যে ইংরেজীর চর্চা লোপ পেলে আমাদের জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হবে। ভারত সংবিধানের অষ্টম তফসিলে যে চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার উল্লেখ আছে তার মধ্যে সংস্কৃত আছে অথচ ইংরেজীর নাম নেই। ইংরেজী অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের ভাষা অতএব অন্যতম ভারতীয় ভাষা—এই কারণে তাঁদের মুখপাত্র

শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক অ্যাণ্টনি ইংরেজীকে তফসিলভুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। আমাদের উচিত সর্বতোভাবে এই চেষ্টার সমর্থন করা। আর একটি প্রস্তাব বহুবার আলোচিত হয়ে চাপা পড়ে গেছে—ভারতের সমস্ত ভাষার জন্য রোমান লিপি বা scriptএর প্রবর্তন, অবশ্য বর্ণমালা বা alphabet যে ভাষার যেমন আছে তাই থাকবে। ভারতীয় লিপি চিরকাল সমান ছিল না। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে নাগরী হচ্ছে সংস্কৃত ভাষার লিপি সেজন্য দেবনাগরী নাম। সংস্কৃতের কোন সনাতনী লিপি নেই, দিল্লির লৌহস্তম্ভের লিপি আর সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বহস্তাক্ষরের কোনও মিল নেই অথচ ভাষা উভয়েরই সংস্কৃত। প্রচলিত বিভিন্ন লিপির মায়া ত্যাগ করে সর্ব ভারতের মিলনের যোগসূত্ররূপে রোমান লিপি প্রবর্তনের জন্য প্রবল চেষ্টা আবশ্যক। তুরস্ক তা করে লাভবান হয়েছে, চীন দেশেও তার আয়োজন হচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলা ভাষা বাধা পায় নি, প্রশ্রয়ও পায় নি। ষাট বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার স্থান ছিল না তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। তার কারণ, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী সুধীজন নবদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যও ইংরেজীর তুল্য সমৃদ্ধ হতে পারে এই বিশ্বাসে তাঁরা সাহিত্য সাধনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যতই বিরাগ থাক, ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত জনের প্রবল অনুরাগ ছিল, বিদেশী ভাষা থেকে রাশি রাশি ভাব আহরণ করে তাঁরা বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত করেছিলেন। জনকতক মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলেও বহু শিক্ষিত জন অপ্রমত্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালীর মাতৃভাষাপ্রীতি বেড়ে গেছে।

ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্যের যে গৌরব হিন্দীর তা নেই, সুতরাং ভবিষ্যতে হিন্দী কর্তৃক বাংলা অভিভূত হবে এই ভয় অমূলক।

হিন্দী যদি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা হয়, বঙ্গ-বিহার যদি কোনও কালে যুক্ত হয়ে যায়, তবে অন্য লাভ ক্ষতি যাই হক বাংলা আর সাহিত্যের হানি হবার সম্ভাবনা নেই। বঙ্গ-বিহার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা যদি উৎকট হিন্দীপ্রেমের বশে বাংলা ভাষার উপর উপদ্রব শুরু করেন তবে বাঙালী কি এতই দুর্বল যে তা রোধ করতে পারবে না ?

বাঙালী লেখকরা বহু কাল ধরে ইংরেজী ভাবরাশি আত্মসাৎ করেছেন, তাঁর ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার জাতিনাশ হয় নি। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একটি অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে। নবীন বাঙালীর ইংরেজী জ্ঞান পূর্বের তুলনায় কমে যাচ্ছে। শুনতে পাই অনেক গ্র্যাজুয়েটও ইংরেজী গল্পের বই পড়ে বুঝতে পারেন না সেজন্য আজকাল অনুবাদ গ্রন্থের এত প্রচলন হয়েছে। শুধু ইংরেজী গ্রন্থ নয়, চিরায়ত বা ক্লাসিক বাংলা রচনাও ক্রমশ অবোধ্য হয়ে পড়েছে। যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেক শিক্ষিত লোককে বলতে শুনেছি—কপালকুণ্ডলা বুঝতে পারি না ; আর কালীসিংহের মহাভারত ? ওরে বাপ রে ! হয়তো কিছু কাল পরে রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রও অবোধ্য হয়ে পড়বেন।

কিন্তু ইংরেজী ভাষায় দখল যতই কমুক, ইংরেজী এখনও বাংলা ভাষার গুরুস্থানীয়, বরং গুরুভক্তি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং তার সঙ্গে মোহ এসেছে। বহুপ্রচলিত বাংলা বাক্যরীতি স্থানে ইংরেজী রীতি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। উপযুক্ত বাংলা শব্দ থাকলেও ইংরেজীর মাছিমারা নকলে নূতন শব্দ চালানো হচ্ছে। বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের যেটুকু শাসন ছিল তা লোপ পাচ্ছে, তার ফলে ভাষা উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যেমন নবীন শিক্ষিত জনের অবোধ্য, অনেক আধুনিক

লেখকের ভাষাও তেমনি প্রবীণ পাঠকদের অবোধ্য হয়ে পড়েছে। আধুনিক বাঙালী লেখকদের এই প্রবৃত্তি অনেকের মতে অবাঞ্ছনীয় হলেও রোধ করা অসম্ভব ; ভাল মন্দ নানা পথ দিয়ে ভাষা অগ্রসর হবে এবং যে রীতি অধিকাংশ সুধী জনের সম্মত তাই কালক্রমে প্রতিষ্ঠা পাবে।

গত ৫ নভেম্বরে Nature পত্রিকায় Dr. John R. Baker একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

Many scientific papers published in Great Britain are written in a style quite different from that adopted by good English authors........Three kinds of error are—those of grammar, grandiloquence, and German construction.

ইংরেজী লেখকদের বিরুদ্ধে ইনি যে অভিযোগ এনেছেন আধুনিক অনেক বাংলা লেখকদের সম্বন্ধেও তা খাটে—ব্যাকরণের ভুল, আড়ম্বর, এবং (জর্মানের বদলে) ইংরেজী বাক্যরীতি।

হিন্দীর কিছু প্রভাব বাংলা ভাষার উপর অবশ্যই আসবে। হিন্দীর মহত্ত্বের জন্য নয়, ভারতের সর্বাধিক প্রচলিত এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা বলেই আসবে। তার লক্ষণ এখনই দেখা যায়। অনেক বাঙালী লেখক 'নূতন' স্থানে 'নয়া', 'সমুদ্র' স্থানে 'দরিয়া', 'স্বাধীনতা' স্থানে 'আজাদী' লিখতে ভালবাসেন। অনেকে 'প্রদেশ, বিপ্লব, শিল্প' স্থানে 'প্রান্ত, ক্রান্তি, উদ্যোগ' লিখছেন। কালক্রমে হয়তো 'অনুগ্রহ-পূর্বক' স্থানে হিন্দী 'কৃপয়া', ডাকবাক্স স্থানে 'চিঠ্ঠি ঘুসেড়', 'জরুরী' স্থানে 'ধড়াধড়' চলবে। অনেক বাংলা বই-এর নাম মলাটের উপর নাগরী ছাঁদে লেখা হয়। বাঙালী যদি রাশি রাশি ইংরেজী ভেজাল হজম করতে পারে তবে একটু ভারতীয় ভেজাল সইবে না কেন?

১৩৬৩